স্বরাজের আসল লড়াই

ধীরেন্দ্র মজুমদার

অনুবাদক

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ

১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

স্বরাজের আসল লড়াই

ধীরেন্দ্র মজুমদার

অনুবাদক

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ

১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬০

শ্রীফণীন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক
জামসেদপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ সাকচীতে মুদ্রিত
ও
অখিল ভারত সর্ব্বসেবা সঙ্ঘের তরফে
মনীষা প্রকাশন কর্ত্তৃক
জামসেদপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস ভবন, সাকচী
জামসেদপুর হইতে প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

ভূমিকা

অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের গান্ধীজীর স্থলাভিষিক্ত সভাপতি ধীরেন্দ্র মজুমদারের নূতন করে পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। প্রথম জীবনে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে গান্ধীজীর ডাকে আরও বহু যুবকের মত অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বন্যার জল সরে গেল; কিন্তু ধীরেন্দ্র মজুমদার দিগ্‌দর্শক নেতার কাছ থেকে প্রাণে যে আগুনের পরশ মণির ছোঁয়া পেয়েছিলেন তার প্রভাবে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁর তেত্রিশ বছরের আত্মসমাহিত অতন্দ্র সাধনায় পূর্ব্বাচার্য্যেরই মত ভারতের সঠিক চিত্র তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং দেশের সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠিও তিনি খুঁজে পেলেন। দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও কল্পনার পরিচয় এই বইএ পাওয়া যাবে, সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ধীরেন্দ্র মজুমদারে বৈশিষ্ট তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ ধার অসির মত যুক্তি এবং প্রাঞ্জল বক্তব্য। রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দুরূহ তথ্য অতি সহজ ও সরল ভাবে সর্ব্বজন বোধ্য করে তিনি এইজন্য লিখতে পারেন যে এ সব তাঁর কাছে উপলব্ধ সত্য। কারও দোহাই বা কোটেশনের জোরে তিনি বাজারে চলেন না। এক কথায় স্বকীয় বৈশিষ্টে ভাস্বর মনস্বী

চিন্তানায়ক তিনি। তাঁর যাবতীয় মূল রচনা হিন্দিতে। বাঙলা ভাষায় তাঁর রচনাবলীর অনুবাদ করে বাঙালী পাঠককে এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কর্মী পুরুষের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করিয়ে দেবার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

চিরকুমার এই কর্ম্মবীরের পরিচয় বহন করে দ্রোণাচার্য্যেরই মত বিহার ও উত্তর প্রদেশে তাঁর অগণিত শিষ্যদল। গান্ধীজীর তিরোধানের পর থেকে ভারতের রঙ্গমঞ্চে বিনোবার সর্ব্বসমক্ষে আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে ধীরেন্দ্র মজুমদার ছিলেন কর্মীদের প্রেরণার উৎস স্বরূপ। তাই পরোক্ষভাবে ভারতের কোণে কোণে যে সব সর্ব্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী কর্মী আছেন, তাঁরা সকলেই তাঁর শিষ্য স্বরূপ। এই শিষ্য সৃষ্টিই তাঁর বিশিষ্ট সাধনা। এই উদ্দেশ্যে আজ কয়েক বৎসর হল বিহারের মুঙ্গের জেলার খাদি গ্রামে (পোঃ মল্লেপুর) তিনি এক কর্মী শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের যে সব নবযুবক বিশ্বে শোষণের অবসান ঘটিয়ে এক নববিধান রচনা করে সাম্য ও শান্তির পথ রচনা করতে চান তাঁরা সানন্দে পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

বাঙলায় অনূদিত তাঁর প্রথম বই "স্বাধীনতার সংকটের" মত এটীও তাঁর বিভিন্ন স্থানে জনসমাবেশ ও কর্মী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরিকার সার সংকলন। হিন্দিতে কয়েক মাসের মধ্যেই বইটীর দু হাজার কপি বিক্রয় হয় এবং এ যাবত এর একাধীক সংস্করণ হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে চিন্তাশীল বাঙালী পাঠকের

সামনে এই বইটী 'স্বাধীনতার সংকটের' মতই আদৃত হবে। অবশ্য শুধু বইটীর প্রচারই বড় কথা নয়, তামসিকতার যে ঘন ঘোর মেঘে আবৃত হবার জন্য আমাদের গঠনধর্মী কর্ম্মশক্তি নিঃশেষের পর্য্যায়ে এসে আমাদের আত্মাভিমানী সমালোচক মাত্রে পর্য্যবসিত করেছে, ধীরেন্দ্র মজুমদারের রচনা পাঠে সে মোহ জাল ছিন্ন করে আমরা যেন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করার উদ্দীপনা ফিরে পেতে পারি।

আমার এই অনুবাদ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হতে পেরেছে শ্রদ্ধেয় ধীরেনদারই সর্ব্ববিধ সাহায্যের কল্যাণে। সুতরাং এর সর্ব্ববিধ প্রশংসা তাঁর।

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বারী আশ্রম, গোবিন্দপুর
পোঃ—কালিকাপুর, সিংভূম।

স্বরাজের আসল লড়াই

আজকে ভারতের পরিস্থিতি বড়ই বিচিত্র। আজকের এ অবস্থায় সবাই নাজেহাল। কিছুদিন যাবত আমি ভারতের গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সময় সময় সহরেও যাই। তবে যেখানেই যাই না কেন, সকলের চেহারাতেই কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব লক্ষ্য করি। আজ সরকার বিচলিত। বহুবিধ সমস্যা তাদের উৎকণ্ঠার কারণ। নেতৃবৃন্দও বিচলিত। কারণ তাঁরা অদ্ভুত এক চোরা-বালির মধ্যে আটকে পড়েছেন এবং এর থেকে বেরোনর রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট খাট কর্ম্মীর দলও হতাশা পীড়িত। স্বরাজের সংগ্রামের সময় তাদের ভিতর যে উদ্দীপনা বর্ত্তমান ছিল তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যেকের মুখে আজ নিরাশার ছায়া পড়েছে। কি যে করা দরকার তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের পথ প্রদর্শক হবার মত কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জনসাধারণও অস্থিরচিত্ত। যে দিকে তাকান যাক না কেন শুধু নিরাশা আর নিরাশাই চোখে পড়ে। দেশের বাবু সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট! কৃষক অসুখী!! শ্রমিকরাও ক্ষুব্ধ!!!

স্বাধীনতা পাবার পর যদি এই অবস্থা হয় তবে কেমন ধারা এই স্বাধীনতা? ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল দুর্দ্দশা থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং নিজের অবস্থার উন্নতির

স্বরাজের আসল লড়াই

আজকে ভারতের পরিস্থিতি বড়ই বিচিত্র। আজকের এ অবস্থায় সবাই নাজেহাল। কিছুদিন যাবত আমি ভারতের গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সময় সময় সহরেও যাই। তবে যেখানেই যাই না কেন, সকলের চেহারাতেই কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব লক্ষ্য করি। আজ সরকার বিচলিত। বহুবিধ সমস্যা তাদের উৎকণ্ঠার কারণ। নেতৃবৃন্দও বিচলিত। কারণ তাঁরা অদ্ভুত এক চোরা-বালির মধ্যে আটকে পড়েছেন এবং এর থেকে বেরোনর রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট খাট কর্ম্মীর দলও হতাশা পীড়িত। স্বরাজের সংগ্রামের সময় তাদের ভিতর যে উদ্দীপনা বর্ত্তমান ছিল তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যেকের মুখে আজ নিরাশার ছায়া পড়েছে। কি যে করা দরকার তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের পথ প্রদর্শক হবার মত কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জনসাধারণও অস্থিরচিত্ত। যে দিকে তাকান যাক না কেন শুধু নিরাশা আর নিরাশাই চোখে পড়ে। দেশের বাবু সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট! কৃষক অসুখী!! শ্রমিকরাও ক্ষুব্ধ!!!

স্বাধীনতা পাবার পর যদি এই অবস্থা হয় তবে কেমন ধারা এই স্বাধীনতা? ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল দুর্দ্দশা থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং নিজের অবস্থার উন্নতির

জন্য। তাহলে যে স্বরাজের ফলে দুর্দ্দশা কমার বদলে বেড়ে গেছে তার মূল্য কতটুকু? বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এ সব কথা স্বভাবতই আপনাদের মনে ওঠে। আপনারা সবাই দুরবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং কোন রাস্তা খুঁজে না পেয়ে হয়ত পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেন। হয়ত এমন হওয়া খুব স্বাভাবিক। পরাজিত জনসাধারণের আর করবারই বা কি আছে? নিজের হয়রাণীর জন্য অপর কারও প্রতি দোষারোপ করা হয়ত সাধারণ মানুষের স্বভাব। কিন্তু এ জাতীয় পরস্পর দোষারোপনের দ্বারা কি সমস্যার সমাধান হবে? আপনারা যদি সুখ শান্তিতে থাকতে চান, মানুষের মত এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা যদি আপনাদের কাম্য হয়, তবে গভীরভাবে এ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। বর্ত্তমান অস্থির চিত্ততা এবং দুর্দ্দশার কারণ খুঁজে বার করতে হবে এবং তার নিরাকরণের কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। কারণ এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করে আপনারা যদি এর আবর্ত্তে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকেন, তবে ধ্বংস ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

গান্ধীজীর জীবদ্দশায় এ জাতীয় সমস্যা দৃষ্টিগোচর হলে আমরা তাঁর কাছে যেতাম। তিনি আমাদের পথ নির্দ্দেশ করে দিতেন এবং আমরা তাঁর কথা মত কাজে লেগে যেতাম। কিন্তু আজ তিনি নেই এবং তাঁর মত পথনির্দ্দেশকারক গুরুও কেউ নেই। গুরুর অবর্ত্তমানে গুরু মন্ত্রই হয় মানুষের শরণস্থল। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা তো এতদূর পর্য্যন্ত বলেছেন যে গুরুর চেয়ে

গুরুমন্ত্রের শক্তি বেশী। সুতরাং আজ আমাদের সকলকে গান্ধীজী প্রদত্ত মন্ত্রের পুনরালোচনা করতে হবে এবং ভেবে দেখতে হবে যে তিনি আমাদের কি বলে গেছেন।

আপনারা জানেন যে গান্ধীজী ত্রিশ বৎসর যাবত বলে এসেছেন যে চরখা চালিয়ে স্বরাজ আসবে। বার বার তিনি আমাদের ঘরে ঘরে চরখা ও গ্রামে গ্রামে তাঁত চালাতে বলেছেন। তিনি বলতেন যে ঘরে ঘরে চরখা না চালিয়ে ভারতে স্বরাজ আসবেনা। কিন্তু অপনারা অবশ্যই বলতে পারেন যে ঘরে ঘরে চরখা না চালিয়েই তো স্বরাজ পাওয়া গেল। এ কথা যথার্থ হলে বলতে হয় যে গান্ধিজীর ভবিষ্যদ্বানী অসত্য প্রমান হয়েছে। সুতরাং যার কথাই মিথ্যা তিনি আবার যুগপুরুষ আর অবতার হন কেমন করে? শাস্ত্র বলছে যে নকল ঋষির পূজা কোরনা। অতএব গান্ধীজী যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত হন তবে আপনাদের সকলের কর্ত্তব্য হচ্ছে ভারত থেকে গান্ধীজীর নাম মুছে ফেলার কাজে আত্মনিয়োগ করা। কোথাও যেন তাঁর ছবি বা প্রতিমূর্ত্তি না থাকে এবং কেউ যেন তাঁর নামোচ্চারণ না করেন। তবে আপনাদের চেহারা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে একথা আপনাদের কাণে ঢুকলেও মনে ধরছে না। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে আপনারা গান্ধীজীকে নকল ঋষি বলে মেনে নিতে রাজী নন। অতএব গান্ধীজীকে যদি সত্য সত্যই ঋষি আখ্যা দিতে হয় তবে তিনি অবশ্যই যুগপুরুষ এবং যুগাবতার ছিলেন এবং তাঁর কথাতেও সত্য ছিল। অথচ গান্ধীজীকে যদি সত্যদ্রষ্টা বলে মানতে হয় তাহলে

আপনারা যে স্বরাজ পেয়েছেন তাকে মিথ্যা বলতে হয়; কারণ পরস্পর বিরোধী ছুটী কথা সত্য হতে পারে না। প্রথম কথা সত্য হলে দ্বিতীয়টী মিথ্যা এবং দ্বিতীয়টী সত্য হলে প্রথমটী মিথ্যা।

সুতরাং গান্ধী ভ্রান্ত না স্বরাজ মিথ্যা—আজ আপনাদের এই কথার নিষ্পত্তি করতে হবে। গান্ধী ভ্রান্ত হলে তাঁর নাম লোপ করার জন্য লেগে পড়ুন আর এ স্বরাজ মিথ্যা হলে আসল স্বরাজ স্থাপনা করার জন্য এক নূতন আহবে নিজ জীবন অর্ঘ্য দিন। এই ছুয়ের মধ্যে এক পথ গ্রহণ করা ছাড়া আপনাদের নিষ্কৃতি নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে যদি এই স্বরাজ মিথ্যা হয় তবে আমরা যে স্বরাজ পেলাম তা কেমনতর আর কারই বা সে স্বরাজ ? এ সব কথা আপনাদের ভেবে দেখতে হবে। এ স্বরাজ কার—এ প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য আপনাদের কোন গভীর গবেষণায় মগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। আপনাদের গ্রামে প্রায়ই বিবাহ আদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কার ঘরে বিয়ে হচ্ছে একথা জানার জন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন ঘটে না। যার ঘর সাজান এবং যার ঘরে বাজনা বাজছে, বিয়েটা যে তাদেরই ঘরে একথা একটী ছোট্ট ছেলেও বুঝতে পারে। দীপাবলীর দিন যাদের ঘরে প্রদীপ জ্বলে দীপাবলী তাদের এবং হোলীর দিন যে বাড়ীতে রং খেলা হয় হোলী যে তাদেরই—এটুকু সবাই জানে। এইভাবে ১৫ই আগষ্টের দিন যাদের ঘর সুসজ্জিত দেখা যায় এবং যারা উৎসবের আয়োজন করেন, স্বরাজ যে তাদেরই একথা বুঝতে

হবে। সেদিন আপনারা সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন তো দেখতে পাবেন যে কলকাতা, বোম্বাই এবং দিল্লী আদি বড় বড় সহরের বড় বড় বাড়ীতে খুব ধুমধামে উৎসবানুষ্ঠান হচ্ছে। উৎসবের রংএর কথঞ্চিৎ পরশ দেখতে পাওয়া যায় লক্ষ্মৌ, পাটনা আদি ছোট ছোট রাজধানী এবং ঐ জাতীয় সহরে। এই সব সহরের এক আধটী হর্ম্ম্যও এ দিন সুসজ্জিত দেখা যাবে। কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামের কোটী কোটী পর্ণকুটীরের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করেন তবে আপনারা বুঝতেই পারবেন না যে আজকের দিনের কোন বৈশিষ্ট আছে। এ দেখে আপনাদের কি মনে হয়? আজ বড় বড় সহরের বড় বড় বাড়ীর স্বরাজের দিন—নয়কি?

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে আমাদের ছোট বড় সব নেতা এবং আমরা বার বার বলে এসেছি যে স্বরাজ মানে হচ্ছে জনসাধারণের রাজত্ব এবং ভারতের জনসাধারণ থাকে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের পর্ণকুটীর গুলিতে। সুতরাং ভারতের স্বরাজের অর্থ হচ্ছে আপনাদের পর্ণকুটীর সমূহের স্বরাজ। স্বরাজের দিনে যদি আপনাদের পর্ণকুটীর সমূহে প্রদীপ না জ্বলে তবে কিসের স্বরাজ? আর তা জনতার রাজত্বই বা হয় কেমন করে? তাহলে যে রাজত্ব আজ আপনারা দেখছেন তা কি বৈদেশীক রাজ? কিন্তু একথা তো সত্য নয়। তাহলে যে রাজত্ব স্বরাজ নয় বিদেশী রাজত্বও নয়, সে জিনিষটীর স্বরূপ কি তা আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে। এই রাজত্ব যে কেমন সেই কথাটাই আজ আমি আপনাদের বলতে চাই।

রামায়ণের কাহিনী আপনারা সকলে জানেন। ভারতের লক্ষ্মীরূপী সীতা দেবীকে রাবণ হরণ করে লঙ্কা দ্বীপে নিয়ে রাখে। শ্রীরামচন্দ্র দেশের বানর সেনাকে সংগঠিত করে লঙ্কা থেকে সীতার উদ্ধার করেন ও তাঁকে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। সমগ্র রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সার এইটুকু। এইভাবে কলিযুগে ভারতের রাজসিংহাসন ইংরেজরা হরণ করে ইংলণ্ড নামক দ্বীপে নিয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী আমাদের মত বানর সেনাদের সুসংগঠিত করে রাজসিংহাসনকে ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসে আপনাদের পর্ণকুটীরে স্থাপনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্গত হয়েছিলেন। নিজেদের বানর সেনা আখ্যা দেওয়ায় আপনারা হাসছেন কেন? আপনারা কি জানেন না যে বানর সেনা কেমন ছিল? শ্রীরামচন্দ্রের নেতৃত্বে সংগ্রাম করে তারা ত্রিলোক বিখ্যাত পরাক্রমী রাবণকে পরাজিত করে। তারাই আবার যখন রামচন্দ্রের আওতা থেকে দূরে সরে গেল তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি দাঁত দেখিয়ে মুখ ভেংচিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে যাওয়ার বদ অভ্যাস রপ্ত করল এবং কার বোঁচকায় ছোলাভাজা আছে তারই সন্ধানে লেগে গেল। জনসাধারণ রামচন্দ্রের অনুচর হিসাবে তাদের পূজাও করে আবার দূর দূরও করে। আমাদের দশাও ঠিক ঐ রকম। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগ্রাম করে আমরা যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না, তাকে পর্যুদস্ত করেছি। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের বন্ধনমুক্ত হতেই আমরা পরস্পরের প্রতি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঝগড়ায় মেতে উঠেছি এবং তাক পেলেই বোঁচকা বুঁচকির সন্ধান করছি। জনসাধারণ

আমাদের সামনে হাত জোড় করে আবার গালি গালাজও করে। এবার বোধহয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কেন আমরা বানর সেনা? যাই হ'ক, আমি আপনাদের এই কথা বলেছিলাম যে গান্ধীজী আমাদের এই বানর সেনার বাহিনী নিয়ে ইংলণ্ড থেকে রাজ সিংহাসন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র যেমন ভারত-লক্ষ্মীকে নিয়ে সোজা অযোধ্যা চলে গিয়েছিলেন, তেমনি দুর্ভাগ্য বশতঃ গান্ধীজী আমাদের রাজ সিংহাসন নিয়ে আপনাদের পর্ণ-কুটীর পর্য্যন্ত পৌছাতে পারলেন না। তিনি এই সম্পদ নিয়ে দিল্লী, কলকাতা, পাটনা আদি রাজধানী সমূহে পৌছানর পরই এক উন্মাদ তাঁকে হত্যা করায় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। আমাদের স্বরাজ ঐ পর্য্যন্ত এসেই আটকে পড়েছে।

মৃত্যুকালে গান্ধীজী আমাদের বলেছিলেন যে এই রাজ সিংহাসনে বসা ঠিক হবে না; সিংহাসনকে টেনে এনে সাত লক্ষ গ্রামের পর্ণকুটীরে স্থাপনা করার পর মিলবে নিশ্বাস নেবার অবকাশ। কংগ্রেসীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "তোমরা সংগ্রাম করে ইংরেজের শাসন থেকে দেশ মুক্ত করেছ। এবার লোক সেবক রূপে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সংগঠিত করে তাদের মধ্যে রাজসিংহাসন গ্রামে গ্রামে স্থাপনা করার শক্তি সৃষ্টি কর। দেশে নূতন আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধনের প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ কর।" কিন্তু আমরা তাঁর উপদেশে কর্ণপাত না করে তার বিপরীত আচরণ, অর্থাৎ কে সিংহাসনে বসবে এই নিয়ে ঝগড়া সুরু করেছি। ফলে সিংহাসন মধ্য পথে আটকে

য়েয়ে ঝুলে আছে।

আপনারা পুরাণে পড়েছেন যে একজন রাজা স্বর্গে যাবার কালে নিজের ভুলে মাঝ পথে আটকে পড়েন। তিনি না স্বর্গলোকে পৌঁছালেন আর না মর্ত্তে রইলেন। সেই রাজার নাম হচ্ছে ত্রিশঙ্কু। এইভাবে আমাদের রাষ্ট্রও ত্রিশঙ্কু হয়ে গেছে এবং এর স্বরূপের সাথে ত্রিশঙ্কুর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পুরাণে লেখা আছে যে ত্রিশঙ্কু রাজা উল্টা ভাবে অর্থাৎ মাথা নীচু দিকে এবং পা উপর দিকে করে আটকে যান। এ রাষ্ট্রও উল্টা হয়ে গেছে। এর শিকড় দিল্লীতে এবং শাখা প্রশাখা আপনাদের গ্রামের দিকে বাড়ছে। এই উল্টা পদ্ধতি এতদূর গড়িয়েছে যে আপনাদের পঞ্চায়েতও উপর থেকে পার্শ্বেল হয়ে আসে। একথাও আপনারা জানেন যে ত্রিশঙ্কুর মুখ থেকে ক্ষরিত লালা দ্বারা যে কর্ম্মনাশা নদীর সৃষ্টি হয় তাতে যে কেউ পা দিক না কেন, তার সারা জীবনের কর্ম্ম নষ্ট হয়ে যায়। আজ আমাদের এই রাষ্ট্রেরও একই দশা। আমাদের মধ্যে যে কেউ এই রাষ্ট্রযন্ত্র স্পর্শ করছি তার বিগত ত্রিশ বৎসরের ত্যাগ ও তপস্যার প্রভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই স্বরাজের ব্যর্থতা কোথায় এবং এর সঠিক রূপরেখাই বা কেমন।

আপনাদের মধ্যে অনেকেরই সাঁতার দিয়ে নদী পার হবার অভিজ্ঞতা আছে। অপর তীরে পৌঁছাবার আগেই যদি আপনারা মাঝ দরিয়ায় হাত পা নাড়া বন্ধ করে দেন, তাহলে আপনারা নিশ্চয় ডুবতে থাকবেন এবং অশেষ কষ্ট পাবেন। আপনারা

স্বরাজের লড়াই সুরু করেছিলেন স্বরাজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পর্ণকুটীর নিবাসী জনসাধারণের রাজত্বের লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌছানর জন্য। কিন্তু আপনারা দিল্লী আর কলকাতার ইমারত সমূহের রাজত্ব পর্য্যন্ত পৌঁছাবার পর হস্তপদ সঞ্চালন বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই আপনারা মাঝ দরিয়ায় রয়ে গেছেন। এইজন্য আপনারা ডুবছেন এবং বহুবিধ কষ্ট ভুগছেন।

কোনখানে এই স্বরাজের অসারত্ব তা আপনারা দেখতে পেলেন। এবার গান্ধীজীর কথায় কতটুকু সত্য আছে তা একবার দেখুন। মৃত্যুর পূর্ব্বে গান্ধীজী তিনটী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রথমটী হচ্ছে এই যে ঘরে ঘরে চরখা না চালান পর্য্যন্ত আমরা স্বরাজ অর্থাৎ জনসাধারণের রাজ অর্জন করব না। তিনি আরও বলেছিলেন যে ঘরে ঘরে চরখা চালিয়ে যদি আমরা আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জন না করি তবে এই অসম্পূর্ণ স্বরাজ বা স্বদেশী রাজও আমরা হারাব। তাঁর তৃতীয় বক্তব্য ছিল এই যে ঘরে ঘরে চরখা না চালালে আমরা অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হব। গান্ধীজীর এই তিনটী ভবিষ্যদ্বাণীর বিশদ পর্য্যালোচনা করলে আপনারা বর্ত্তমান অশান্তির মূলে পৌছাতে পারবেন।

চরখা না চালালে কি ভাবে আমরা এই স্বদেশী রাজও খোয়াব প্রথমতঃ আমি তারই আলোচনা করব। আপনারা প্রত্যেকেই আজ একথা অনুভব করেন যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশবাসীর সামনে সর্ব্বাপেক্ষা জটীল সমস্যা হচ্ছে ভাত কাপড়ের সংস্থান করা। দেশের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে এ সমস্যার সমাধান

করা না করার উপর এবং এর সমাধানের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরিত রয়েছে দেশের ভবিষ্যত। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের নেতৃত্ব ও পরিচালন ক্ষমতা রয়েছে বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপর। আপনারা জানেন যে কাশীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কোন সমস্যা সমাধানের ভার দিলে তাঁরা সমাধানের সূত্র খুঁজে বেড়াবেন প্রাচীন পুঁথি পত্র থেকে। এর বাইরে যে কিছু থাকতে পারে একথা তাঁদের চিন্তাতেও আসেনা। এইভাবে আজকের পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতির পণ্ডিতগণ দেশের এই ত্রিবিধ সমস্যার সমাধানের সূত্র দেড় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজে বেড়ান। গান্ধীজীর কথা তাঁরা বুঝতে পারেন না। যুগে যুগে যুগপুরুষরা সে যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী তৎকালীন সমস্যা সমূহের সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করেন। তাঁরা পূর্ব্ব প্রচলিত শাস্ত্রের বিধান বহির্ভূত কথা বলেন। গান্ধীজীও যে সব কথা বলেছেন ইংরেজী পুস্তকরাজীতে তার উল্লেখ নেই। এই কারণে গান্ধীজী বিগত ত্রিশ বৎসর যাবত ক্রমাগত চেষ্টা করা সত্বেও বিদ্বান নেতৃবর্গের মস্তিষ্কে গান্ধীজীর কথা অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। তার চেয়েও দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে এই যে আপনাদের মগজেও গান্ধীজীর কথা ঢোকেনি। আপনারা তো তাঁকে শুধু মনে আসন দিয়েছেন। আপনাদের মস্তিষ্কে এখনও ইংরেজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সেখানে গান্ধীজীর স্থান কোথায়? হৃদয় দিয়ে যখন আপনারা বিচার করেন তখন গান্ধীজীর পূজা করেন, আর মস্তিষ্ক দিয়ে তাঁর বক্তব্য বিচার করার সময় তাঁকে বোকা মনে করেন। আপনারা তখন

বলেন যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই চরখা দ্বারা কি হবে ? সুতরাং আপনারা এবং আপনাদের নেতৃবৃন্দ গান্ধীকে মূর্খ মনে করে ইংরেজী পুস্তক সমূহে লিখিত কথার পিছনেই দৌড়ান সুরু করেন।

একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে ভাত কাপড়ের সমস্যার সমাধান দুটী মাত্র পন্থায় হওয়া সম্ভব। হয় গরু লাঙ্গল, ঢেঁকি জাঁতা, ঘানী এবং চরখা তাঁত দ্বারা আর নয় ট্রাক্টর মেশিন এবং কলকারখানা দ্বারা। প্রথম পদ্ধতিটী হচ্ছে গান্ধীজীর এবং এ পদ্ধতি আপনাদের অভিপ্রেত নয়। ফলে দেশ ট্রাক্টর এবং কলকারখানার পথেই চলছে। কিন্তু এ পথে চললে আপনাদের দশা যে কি হবে সে সম্বন্ধে একবার গভীরভাবে চিন্তা করুন। একথা আপনারা নিশ্চয় উপলব্ধি করেন যে ট্রাক্টর এবং কলকারখানার জন্য আপনাদের মোটা রকমের পুঁজি চাই। এর জন্য চাই সোনা। এই ভারতভূমিতে এককালে সোনার ছড়াছড়ি ছিল। এ দেশের সম্পদের প্রাচুর্য্য নিয়ে দেশে দেশে নানা কাহিনী প্রচলিত ছিল। অনেক দেশে লোক বলত যে ভারতবর্ষে সোনার ডিম পাড়া পাখী আছে। কিন্তু আজ আমরা হৃতসর্ব্বস্ব। বেনিয়া ইংরেজ যেদিন দেখল যে এ দেশের দেহে শুধু হাড় ছাড়া রক্ত মাংসের লেশ মাত্র নেই—সেই দিন তারা আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছে। সুতরাং ট্রাক্টর এবং কলকারখানার রাস্তায় চলতে হলে দেশের সামনে সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে দাঁড়াবে পুঁজির অভাব।

ভারত ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। আপনারা সবাই জানেন যে দেশের শতকরা নব্বই জন গ্রামেই থাকে। তাদের কর্ষণযোগ্য

ভূমির অভাব; সুতরাং তাদের কোন উপজীবিকা প্রয়োজন। কিন্তু কলকারখানা দ্বারা দেশের প্রয়োজন পূর্ত্তির ব্যবস্থা করলে এরা কাজ পাবে কি ভাবে ? আপনারা জানেন যে কোথাও একটী মাত্র চালের কল খুললে হাজার হাজার ঢেঁকি বেকার হয়ে যায়। সুতরাং এইভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর জন্য কলকারখানা খুললে যে আরও কত লোক বেকার হয়ে পড়বে একথা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। ট্রাক্টর এবং কলকারখানার অপ্রতিহত প্রসারে দেশে বিষম বেকার সমস্যা দেখা দেবে। এ শুধু আমাদের অভিমত নয়। আমাদের তো লোকে সেবাগ্রামের কুপমণ্ডুক বলে। আমাদের মত কুপমণ্ডুকদের কথা না হয় ছেড়েই দিন। কিন্তু মোটা মোটা অর্থনীতির গ্রন্থ পাঠকারী দেশের বিদ্বৎসমাজেরও এই অভিমত।

শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, শ্রীজহরলাল নেহেরু, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আদি ব্যক্তিদের তো আপনারা কুপমণ্ডুক অপবাদ দেবেন না। তাঁরা তো অর্থনীতির বড় বড় পণ্ডিত। শ্রীযুক্ত বিড়লা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীবৃন্দ মিলে 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে জাতীয় উন্নয়নের এক পরিকল্পনা রচনা করেন। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় একথা স্বীকার করে-ছিলেন যে দেশজোড়া বেকার সমস্যা ও পুঁজির অভাব দূর করার জন্য আমাদের কুটীর শিল্প চালাতেই হবে। এই একই কথা জওহরলালজী বার বার নিজ বক্তৃতায় বলছেন। তাঁর বক্তৃতার কিয়দংশ আপনাদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি :—

"একদিকে আমরা উৎপাদন বাড়াতে ইচ্ছুক এবং অন্য দিকে

লক্ষ লক্ষ লোক বেকার। এ অবস্থা ন্যায়শাস্ত্র বিরুদ্ধ। বেকারদের কোথাও না কোথাও কিছু উৎপাদন করা প্রয়োজন; কারণ তাদের পেট তো খালি রাখা চলবে না। সেইজন্য আমরা যত দ্রুতগতিতে দেশে শিল্পীকরণ করি না কেন আমাদের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জনসাধারণকে কি ভাবে এর মারফত কাজ দেব? ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের কারখানাগুলিতে খুব বেশী হ'লে দু কোটী, তিন কোটী কি তার চেয়েও কিছু বেশী লোক কাজ পাবে। এ সত্বেও যারা বাকী থাকবে তাদের কি উপায় হবে? কুটীর শিল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সি[illegible] পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এই সব বেকারদের [illegible] না দেওয়া পর্য্যন্ত এদের শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে না।"*

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণও বলেন যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে ভবিষ্যৎ অর্থব্যবস্থায় গান্ধীবাদ এবং মার্কসবাদের সংমিশ্রণ সাধন করা অতি প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু বিপদের কথা হচ্ছে এই যে ইংরেজী অর্থনীতির পুস্তকে কুটীর শিল্পের উল্লেখ থাকলে কি হবে চরখা আর ঢেঁকির তো নাম নেই তাতে। এইজন্য বিদ্বানরা কুটীর শিল্পের কথা বললেও চরখা ও ঢেঁকির কথা তাঁদের মনে ধরে না। আচ্ছা আপনারাই বলুন তো কুটীর শিল্পের ক্ষেত্র থেকে লাঙ্গল, ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি এবং চরখা ও তাঁত বাদ দিলে গ্রামে এমন আর কোন কুটীর শিল্প বাকী থাকে যার দ্বারা ভারতের বেকার সমস্যা দূর করা সম্ভব? কোথাও কিছু লতা পাতার কাজ

* হিন্দুস্থান টাইমস ২৪-৬-৫০। চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরীক সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ।

বা দড়ি, ঝুড়ি চুপড়ি অথবা কিছু খেলনা ও বড় লোকের ঘর সাজানর সাজ সরঞ্জাম তৈরী করে কি এই ভয়ানক বেকারত্বরূপী বন্যার বেগ প্রতিহত করতে পারবেন? বন্ধুগন! এ হওয়া সম্ভব নয় এবং ঘটনার গতিও এদিকে চলছে না। এই কারণে প্রতিনিয়ত আপনারা দেখছেন যে গ্রামের শতকরা পঁচাশী জন অধিবাসী ক্রমশঃ গরীব হচ্ছে আর সহরের শতকরা পনের জন অধিবাসী স্ফীতকায় হচ্ছে। কোন দেশের শতকরা পঁচাশী ভাগ অধিবাসী ক্রমশঃ দরিদ্র হতে থাকলে কি সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব?

আপনাদের মধ্যে যাঁরা গ্রামবাসী, তাঁরা আমার কথা ভাল ভাবে বুঝতে পারছেন এবং তাঁদের পক্ষে আমার কথা মেনে চলাও সম্ভবপর। বিদ্বানরা যতই বিজ্ঞানের দোহাই দিন আর যতই তাঁরা সংখ্যাতত্ত্বের ভোজবাজী দেখান, একথা আপনারা স্পষ্ট জেনে রাখুন যে গান্ধীজীকে বোকা মনে করে তাঁর পন্থানুসরন করার পরিবর্ত্তে আপনারা যদি কলকারখানার প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত হন, তবে দেশে নিশ্চিত ভাবে দুটী কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করবেন। এর প্রথমটী হচ্ছে পুঁজির অভাব এবং দ্বিতীয়টী হচ্ছে বেকারত্বের চোরাবালী।

লোকে আর একটী কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বলেন, "তোমরা আদ্যি কালের চরখার কথা বলছ। সঙ্কীর্ণ গণ্ডি নিয়ে চিন্তা করার যুগ এটা নয়। আজ তো সমগ্র বিশ্বের পট ভূমিকায় আমাদের চিন্তা করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির

কথা বিবেচনা করে আজ ভারতকে কাজ করতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।" বন্ধুগন! আন্তর্জাতিক রাজনীতি বোঝার জন্য মোটা-মোটা পুঁথিপত্র পড়ার প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই সহজে এ বিষয়টী বুঝতে পারি। এর জন্য গ্রামে প্রচলিত একটী ছোট্ট প্রবাদ বাক্য জানাই যথেষ্ট। সেটী হচ্ছে "যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে।" আপনারাই বলুন যে আপনাদের এলাকার রাজনীতি কি? এক কথায় আপনাদের ওখানকার রাজনীতি হচ্ছে এই যে তুই কর্ত্তাব্যক্তির মধ্যে কার প্রতিপত্তি বজায় থাকবে এই নিয়ে পারস্পারীক বিবাদ চলছে। সমগ্র বিশ্বেও এই একই ধরণের রাজনীতি চলছে একথা জেনে রাখুন। সমগ্র বিশ্বে আমেরিকা ও রাশিয়ায় এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে যে পৃথিবীতে কার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হবে? আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই হচ্ছে মূল কথা। আর যা শোনেন, সে সব ফাঁকা বুলি, তার মধ্যে কোন পদার্থ নেই। যে জাতিসঙ্ঘ আজ দেখতে পাচ্ছেন, তা হচ্ছে তুটী যুদ্ধের মাঝে একটু নিশ্বাস নেবার যায়গা। স্কুলের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচ আপনারা অবশ্যই দেখেছেন। ম্যাচের মধ্যে হাফ টাইম বলে খানিকটা সময় থাকে এবং এ সময়ে তু দলের ছেলেরা একত্রে বসে গল্প স্বল্প করে ও একটু বিশ্রাম নেয়। এইভাবে জাতিসঙ্ঘও যুদ্ধের হাফ টাইম। আমি আশা করি যে আপনারা বিশ্বে রাজনীতির এই ধারাটী বুঝতে পেরেছেন যে রাশিয়া এবং আমেরিকা এই তুই দেশের অভিপ্রায় হচ্ছে সারা তুনিয়ায় নিজেদের প্রভাব কায়েম করা।

সুতরাং রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই ভারতে নিজ প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে এবং আমরা গান্ধীর কথায় না চলে তাদের দুজনের জন্য দুটী দরজা খুলে রাখছি যাতে তারা ভিতরে চলে আসতে পারে। আমাদের পুঁজির সমস্যা সমাধান করার জন্য আমেরিকা ডলার হাতে এগিয়ে আসছে। তাদের নিজেদের কোন স্বার্থই নেই। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ যেমন ভারতের উদ্ধার করতে এসেছিল, আমেরিকারও উদ্দেশ্য ঠিক তাই। ইংরেজ এসেছিল সভ্যতার বিকাশের জন্য এবং এঁরা আসছেন আর্থব্যবস্থার উন্নতির জন্য। অন্যদিক দিয়ে বেকারত্বরূপী অরণ্যের মধ্য থেকে মুখে স্বর্গ সুখ দেবার ধুয়ো আওড়াতে আওড়াতে রাশিয়ার আবির্ভাব হচ্ছে। তারপর দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের মাটীতে যে ভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লড়াই হয়েছিল, সেই ভাবে ভারতভূমিতে আবার আমেরিকা ও রাশিয়ার মল্লযুদ্ধ হবে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিজয়ী শক্তিকে আমরা আলিঙ্গন করেছিলাম। সে সময় আমরা ইংরেজকে কোল দিয়েছিলাম ঐশ্বরীক বিধান বলে এবং এবার বিজেতাকে আলিঙ্গন করব ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আখ্যা দিয়ে। তফাৎ হবে শুধু এইটুকুর যে প্রথমে আমরা তাদের দেশ দখল মেনে নিয়েছিলাম আর এবার স্বীকার করে নেব তাদের প্রভাব।

কথা হচ্ছে এই যে লোকে আজকাল পুরানো কথায় বিতৃষ্ণা প্রকট করেন। তাঁরা বলেন যে গান্ধী বড় পুরানো কালের কথা বলেন। চরখা চালিয়ে তিনি দেশকে চারশত বৎসর পিছনে নিয়ে

যেতে চান। লোকে নূতন কিছু করতে চায়। নবীনতা তাদের মনকে আকর্ষণ করে। সুতরাং অনেকে এই ক্ষেত্রেও নূতন কিছু করতে চান। আপনারা জানেন যে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী কন্যা সয়ম্বরা হত। কন্যার সম্রাট পিতা রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত করতেন এবং পুত্রীর হাতে বরমাল্য দিয়ে বিজয়ীর গলায় তা অর্পন করতে বলতেন। বর্ত্তমান কালের নব্য সম্প্রদায়ের এ রীতি মনোমত মনে হচ্ছে না। তাঁরা নূতন কিছু করতে চান। তাঁরা মাকেই শ্বয়ম্বরা দেখতে চান। এই সব ভারত মাতার আধুনিক সন্তানগণ এতই সুযোগ্য যে তাঁরা দুদিকে দুটী দরজা খুলে দিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকাকে আমন্ত্রণ করছেন এবং দেশমাতৃকার হাতে বরমাল্য দিয়ে অর্দ্ধেক লোক আমেরিকার ডলারের পিছনে এবং বাকী অর্দ্ধেক রাশিয়ার গরম গরম ধুয়োর পিছনে চলেছেন যাতে মা বিজয়ী দেশের গলায় হারটী ঠিকভাবে পরাতে পারেন। এই জন্যই গান্ধীজী বলতেন যে ঘরে ঘরে চরখা না চললে যে স্বদেশী রাজ আমরা পেয়েছি তা খোয়াব। কারণ ভাত কাপড়ের সমস্যা সমাধানের জন্য আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত জনশক্তির সংগঠণ না করে আমরা যদি কলকারখানার দিকে দৌড়াই তাহলে আমাদের রাশিয়া বা আমেরিকা, কোন না কোন দেশের অঙ্গুলি হেলনে চালিত পুত্তলিকায় পরিণত হবার আশঙ্কা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আর একটী দিকের কথা চিন্তা করতে হবে। আমাদের বহু শিক্ষিত বন্ধু বলেন, "কেন বৃথা

চরখার কথা বলছেন ? আজ পৃথিবীতে বিশ্বযুদ্ধের কাল মেঘ পৃথিবীর আকাশে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। আজ তো আমাদের দেশ রক্ষার কথা চিন্তা করতে হবে। এইজন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের চরখা এ অবস্থায় কি কাজ দেবে ? এর জন্য তো বড় বড় কারখানা চাই।" বন্ধুগন ! দেশরক্ষার জন্যও চরখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আজকাল যুদ্ধ কি ভাবে চলে তা জানেন ? শত্রুদের দেশে কিছু পঞ্চমবাহিনী ছেড়ে দেওয়া হয়। আসল আক্রমণ সুরু হবার আগেই এরা জনসাধারণের মধ্যে মিশে যায়। তারপর দেশ আক্রান্ত হলে দেশের জনসংভরণ বিভগীয় কলকারখানা ধ্বংস করার জন্য তার উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের অঙ্কুর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সুযোগে জনসাধারণের মধ্যে আত্মগোপনকারী সেই সব পঞ্চম বাহিনী এবার জনসাধারণের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করে যাতে তারা সরকারকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চাপ দেয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জাপান চীনের কারখানা সমূহ ধ্বংস করে দেওয়া সত্ত্বেও চীন সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত কুটীর শিল্পের সাহায্যে বহু বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনারা একথা তো জানেন যে জাপানের বহুবিধ শিল্প এক একটী সহরে কেন্দ্রীত বলে আমেরিকার এক পরমানবীক বোমা জাপানকে নতজানু হয়ে পরিত্রাহি রব ছাড়তে বাধ্য করেছিল। যুদ্ধের সময় সরকার জনসাধারণের কাছে ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহ্বান

জানান। বন্ধুগন ! নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সময়েই জনসাধারণকে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তারা বিলাস ব্যসনের জিনিষের মায়া ছাড়তে পারে; কিন্তু ভাত কাপড়ের অভাব সইতে পারে না। ভাত কাপড়ের অভাব হলে জনসাধারণ অবশ্যই যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী জানাবে। সামনে শত্রুর আক্রমণ আর পিছনে জনসাধারণের আন্দোলন—কোন দেশই এমন অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। ফলে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য শত্রুর সঙ্গে রফা করতে হয়। সুতরাং আজকের বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার দিনেও যদি দেশ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হয় তবে বুদ্ধিমানীর কাজ হচ্ছে দেশের ভাত কাপড়ের উৎপাদন ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ গ্রামের কোটী কোটী পর্ণকুটীরেই পরিব্যাপ্ত করা। এইভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গান্ধীর চরখাকে ছাড়লে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনাদের রাশিয়া বা আমেরিকার ছায়া মাত্রে পর্য্যবসিত হতে হবে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনারা পরাজয় বরণ করবেন।

গান্ধীজীর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এই যে চরখার সাহায্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হ'লে তিনি বার বার কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশীক সরকারদের পরামর্শ দেন যে তাঁরা যেন নূতন কলকারখানা করে নূতন করে পুঁজির পাকে না পড়েন এবং নিজেদের সঞ্চিত পুঁজিও যেন এইভাবে খরচ না করেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে দেশের কোটী কোটী নর নারীকে চরখা চালান শিখিয়ে গ্রামবাসীদের বস্ত্র সরবরাহ করা বন্ধ করে দেওয়া হ'ক। পুরোনো যে সব কাপড়ের কল আছে

তাতে উৎপন্ন বস্ত্রের একাংশ দিয়ে সহরবাসীদের চাহিদা পূর্ণ করে উদ্বৃত্ত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করে খাদ্য শস্য আমদানী করা হ'ক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে অন্ততঃ দশ পনের বৎসর সময় লাগবে। বিগত মহাযুদ্ধের কারণে দেশের বনসম্পদ এবং পশুধন নষ্ট হয়ে গেছে। নূতন বৃক্ষ রোপন করে বন্যা এবং অনাবৃষ্টির হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া বিশ বৎসরের আগে সম্ভব নয়। এইভাবে পশুধনের বৃদ্ধিতেও সময় লাগবে। ততদিন পর্য্যন্ত পুরাতন কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে খাদ্য শস্য আমদানী করে আমরা জীবন বাঁচাতে পারব। আমাদের উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে করতে পুরাতন কলগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিনষ্ট হবে এবং নূতন কলের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কিন্তু গান্ধীজীর এ কথা সকলের মনঃপুত হ'ল না এবং তার ফলে তাঁদের চিন্তাধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হতে লাগল।

আসল কথা হচ্ছে এই যে দেশবাসী বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের অভিমতের অন্ধ সমর্থক হয়ে গেছে। গান্ধীজী কি আর বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন? তিনি তো ছিলেন মহাত্মা। সুতরাং এ সব ব্যাপারের তিনি কি জানেন? দেশে বন্যা এবং অনাবৃষ্টি হয়। এ সমস্যার নিরাকরণের জন্য দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কমিটী বসল। তাঁরা বললেন, "দেশে জঙ্গল কমে গেছে। সুতরাং পাহাড়ে জঙ্গল না থাকায় জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে নদীতে না পড়ে অপ্রতিহত গতিতে এসে নদীতে পড়ে এবং এই

জন্য বন্যা হয়। আবার এই জঙ্গলের স্বল্পতার জন্য বৃষ্টিপাতও কম হয়।” বিশেষজ্ঞরা বিধান দিলেন এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হবার জন্য বনমহোৎসব স্থুরু হ'ল। সরকারী ভবন এবং বাগিচায় বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ রোপিত হতে লাগল। এদিকে খাদ্যাভাব দূর করার জন্য দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আর এক কমিটী বসল। তাঁরা জানালেন যে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদনের মত কৃষিক্ষেত্র নেই। স্থুতরাং বড় বড় মেশিন ও ট্রাক্টর আনিয়ে জঙ্গল কাটিয়ে খেত তৈরী করা হ'ক। পণ্ডিতরা বিধান দিলেন এবং আমরা জঙ্গল কেটে খেত বানান স্থুরু করলাম। এর ফলে একদিকে আমরা সহরকে জঙ্গলে পরিণত করতে লাগলাম এবং অন্যদিকে জঙ্গল কেটে খেত তৈরী করতে লাগলাম। এইভাবে যখন উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহনির্ম্মাণের সমস্যা দেখা দিল, তখন আমাদের কথা কারও মনে ধরল না। ইউরোপ থেকে জনকয়েক বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হল এবং তাঁরা গৃহ-নির্ম্মাণের কারখানা খোলার পরামর্শ দিলেন। প্রায় আশী পঁচাশী লক্ষ টাকা ব্যয় করে কারখানা স্থাপন করা হল। এখন দেখা যাচ্ছে যে ঐ কারখানা কোন কাজেরই নয় এবং একে বন্ধ করার কথা চলছে। * হয়ত কারখানা বন্ধ হতে হতে আরও বিশ পঁচিশ লাখ টাকা খরচ হয়ে যাবে। ভাই সব, এ ভাবে না হবে

* পার্লামেণ্টে সরকারকে এ কারখানা স্থাপন করে অর্থের অপচয় করার জন্য বহু তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এবং অবশেষে প্রায় একবৎসর হল এই কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আপনাদের সমস্যার সমাধান আর না পাবেন আপনারা এই বিষম পরিস্থিতির জাল থেকে মুক্তি। এ যুগের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত প্রাচীন পুঁথিপত্রে পাওয়া যাবে না। বর্ত্তমান কালের যুগ পুরুষের বাণীতে এ সমস্যার সমাধানের চাবি কাঠি আছে। যাঁরা আজ গান্ধীকে বোকা মনে করে ইউরোপ আর আমেরিকার অনুকরণের জন্য সে দেশের শাস্ত্র ঘেঁটে মরছেন তাঁদের রূঢ় আঘাত খেয়ে গান্ধীর রাস্তায় আসতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত খাঁটী কথাটী তাঁদের শিখতে হবেই; কিন্তু তার আগে তাঁদের হটকারিতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য যথেষ্ট খেসারত দিতে হবে। সুতরাং আপনাদের মত গ্রামবাসী ভাইদের এ সব ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং বড় বড় বিদ্বানের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই আবিষ্কার করতে হবে। গান্ধীজীর চরখা সঙ্ঘ আপনাদের সামনেই রয়েছে। শুধু এর অনুবর্ত্তী হতে আপনদের যতটুকু দেরী।

গান্ধীজীর তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এই যে ঘরে ঘরে চরখা না চললে স্বরাজ অর্থাৎ গণরাজ আসবে না। এই কথাটী আপনাদের যথেষ্ট ধীর ভাবে বিবেচনা করতে হবে; কারন এ কথাটীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে আপনাদের মত গ্রামবাসীদের সঙ্গে। এই কথাটী আপনারা যতখানি বিস্তারপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করবেন, সারা দেশে যে হয়রাণী এবং অস্থিরচিত্ততা রয়েছে তার স্বরূপও ঠিক অতটা উপলব্ধি করবেন এবং এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পাবার পথও ক্রমশঃ সেইভাবে আপনাদের সামনে দেখা দেবে।

দেশবাসী যে পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রাম করে ইংরেজদের এ দেশ ছাড়া করল, এর কারণ কি? এ দেশের অধিবাসীদের কি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ ছিল? ইতিহাস থেকে তো এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাঠান এবং মোগলরা বাইরে থেকে এসে সাতশত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছে। জনসাধারণ তো কখনও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। তা হলে একশত বৎসর হতে না হতে জনসাধারণের মনে ব্রিটীশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি হল কেন? তবে ইংরেজরা কি পাঠান এবং মোগলদের চেয়ে খারাপ ভাবে দেশ শাসন করেছে? এমন কথাও তো বলা যায় না, দেশের জনসাধারণ তো ইংরেজের শাসনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল। তারা বলত, "বারে ইংরেজ বাহাদুর! তোমাদের তারিফ আছে। সোনা নিয়ে রাতের বেলায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরে এলেও কেউ কিছু বলবে না।" সারা দেশের গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ ইংরেজ শাসনকে "সরকারই মা বাপ" আখ্যা দিয়েছিল। এই ধরণের জনসাধারণের মনে ইংরেজদের সাথে লড়াই করার কথা কি করে উঠল?

কথা হচ্ছে এই যে পাঠান এবং মোগলরা এদেশে এসে এর বাসিন্দা হয়ে পড়ে। তারা এদেশের সম্পত্তি লুটে নিজ দেশে নিয়ে যেতনা বলে সাধারণ প্রজাদের অবস্থার অবনতি হয়নি। কিন্তু ইংরেজরা শুধু দেশ শাসনের জন্য আসেনি, এদেশের সম্পদ লুট করাই ছিল তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণের স্বচ্ছলতা বজায় থাকলে তারা চিন্তাই করতনা যে কে তাদের উপর রাজত্ব

করছে। ইংরেজের শাসনের ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটল। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ল। সুতরাং তাদের মধ্যে ছটফটানী সুরু হল এবং তারা এর কারণ অনুসন্ধান করতে লাগল। দেশের জনকয়েক বিচারশীল নেতা তাদের বললেন যে তাদের দুরবস্থার মূলে আছে ব্রিটীশ শাসন। সুতরাং ইংরেজের শাসন পাশ থেকে মুক্ত না হলে তাদের দুর্দ্দশার অবসান ঘটবে না। কথাটী সকলে হৃদয়ঙ্গম করল এবং এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজতে লাগল।

যুব সম্প্রদায় স্বাধীনতার জন্য অধীর হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তারা ইংরেজদের বোমা মারা সুরু করল। অনেকের মনে জাপানের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাবার কথা উঠল এবং সে দেশ থেকে সাহায্য পাবার কথাও শোনা যেতে লাগল। এই পদ্ধতিতে আন্দোলন সুরু হবার সূচনাতেই ভারতে গান্ধীজীর আবির্ভাব হল: তিনি এসে আপনাদের এই কথা বললেন যে এ ভাবে বোমা ছুঁড়ে হিংসার পথে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। হিংসা থেকে প্রতিহিংসার জন্ম হবে এবং এইভাবে দেশের অধিকতর ক্ষতি হবে। তা ছাড়া বিদেশী শক্তির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবার অর্থ হচ্ছে নবপর্য্যায়ে পরাধীনতাকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি বললেল যে ব্রিটীশ শাসন হচ্ছে জোঁকের মত রক্ত শোষক। জোঁক ধরলে প্রথমে বোঝা যায় না। কিন্তু পরে যখন জোঁক ক্রমশঃ মোটা হয়ে ওঠে এবং তার মুখের বিস্তার

বেড়ে যায় ও অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে রক্ত শোষণ সুরু করে, তখন টানাটানি করলেও একে ছাড়ান যায় না। তখন তার মুখে নুন দিয়ে ছাড়াতে হয়। গান্ধীজী আমাদের বললেন যে এই জোঁকের রাজা ইংরেজদেরও মুখে নুন দিয়ে এ দেশ ছাড়াতে হবে। এর সাথে সাথে তিনি আমাদের ইংরেজদের শোষণ পদ্ধতির স্বরূপ বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন এই বিদেশী জোঁক হচ্ছে দুমুখো জীব এবং উভয় মুখেই এ আমাদের শোষণ করে। এর একটী হচ্ছে পুঁজিবাদী মুখ অপরটী হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক মুখ। ইংরেজ আমাদের দেশে আসার সময় গ্রামবাসীগণ চরখা এবং কুটীর শিল্পের সাহায্যে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ্ উৎপন্ন করত। ইংরেজরা দেশের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করেছে এবং দেশ বিদেশী মালে ছেয়ে দিয়েছে। বিদেশী মাল আমাদের বিক্রি করে এর বিনিময়ে দেশের সমস্ত সম্পদ তারা লুটে নিচ্ছে। আমরা তাদের নানারকম সৌখিন জিনিষের লোভে পড়ে তাদের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। অন্যদিকে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার জন্য যে পঞ্চায়েত প্রথা ছিল তারা তার বিনষ্টি সাধন করে তার পরিবর্ত্তে এক আমলা-তান্ত্রিক ব্যবস্থা সুরু করেছে। দেশে বড় লাট, ছোট লাট, মেজ লাট এবং সেজ লাট আদির মরশুম পড়ে গেল এবং তাদের শাখা প্রশাখা ডেপুটী এবং ইনসপেক্টরের নাম নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এ সব বিষয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে। গ্রামে ইনসপেক্টর এবং ছোট হাকিমদের ঠেলায় নাভিশ্বাস উঠত।

হয়ত সকালেই দেখলেন যে হ্যাট কোটে শরীর মুড়ে এক ইনসপেক্টর সাহেব গ্রামে হাজির। জিজ্ঞাসায় প্রকাশ পেল যে তিনি হাতে ইনজেকসন দেওয়ার ইনসপেক্টর। এর ঘণ্টা খানেক পরেই আবার কেউ এসে জানালেন যে তিনি ষাঁড় সরবরাহ করার ইনসপেক্টর। এইভাবে ছেলে পড়ানর ইনসপেক্টর, চোর ধরার ইনসপেক্টর, ধান মাপার ইনসপেক্টর, রাস্তার ইনসপেক্টর, মাছ ছাড়ার ইনসপেক্টর আপনাদের সেবা করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। ব্যাপারটা কিছু মন্দ নয়; কারণ বড়লোকের ঘরে তো চাকরীর ছড়াছড়ি। আপনারা এত ধনী ছিলেন যে আপনাদের পাখীও সোনার ডিম পাড়ত। সুতরাং ইংরেজরা আপনাদের মত বড়লোকের সেবা করার জন্য দেশ চাকরে চাকরে ছেয়ে ফেলল। এই সব চাকর আবার কেমন? আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত হাতি পোষেন। হাতিশালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাতি দশ বিশ জন লোকের খোরাক খেয়ে ফেলে। এর পর হাতি কোন কাজে বাইরে বেরোলে পথের দুপাশে খেত খামার এবং দোকানের থেকে শুঁড় বাড়িয়ে কিছু টেনে না নিয়ে ছাড়ে না। এইভাবে এই সকল সরকারী কর্ম্মচারীর আপনাদের খোরাকের দশ বিশগুণ আহার্য্য প্রয়োজন হয় এবং যখন কার্য্যোপলক্ষে এরা বাইরে যায় তখন শুঁড় বাড়িয়ে কিছু না নিলে এদের তৃপ্তি হয় না।

গান্ধীজী বলেছিলেন যে আপনারা যদি ইংরেজের শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বরাজ কায়েম করতে চান, তাহলে বিদেশী মাল বর্জ্জন করে গ্রামের প্রতিটি পর্ণকুটীরে আমাদের নিজস্ব উৎপাদন

ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বিদেশী প্রবর্ত্তিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত রাজ স্থাপন করতে হবে। এ কথায় দেশে নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার হল। যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহের বন্যা এল এবং তারা অসহযোগ এবং বয়কট আন্দোলন তীব্র বেগে চালাল। আপনারাও এর সাথে সহযোগীতা করলেন। তবুও একটী মারাত্মক ভুল হয়ে গেল। আপনারা বিদেশী মাল তো বর্জন করলেন; কিন্তু তার বদলে পর্ণকুটীরে উৎপাদনের ব্যবস্থা না করে বোম্বাই আর কলকাতায় তৈরী মাল বাজারে চালু করে দিলেন। বিদেশী শাসন ব্যবস্থার সাথে অসহযোগ করলেন; কিন্তু বড় বড় সহরের নেতৃত্ব আর প্রভুত্ব মেনে নিলেন। এর ফলে বিদেশী মাল এবং শাসন নিশ্চিহ্ন হল; কিন্তু সহরের মাল আর প্রভুত্ব তার যায়গা দখল করল। আপনাদের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথা পরং। আজও পুঁজিবাদ এবং আমলাতন্ত্রের বোঝা আপনাদের ঘাড়ে আগের মতই চেপে আছে। শুধু লণ্ডনের বদলে দিল্লী এসেছে এবং ম্যানচেষ্টারের স্থান নিয়েছে বোম্বাই ও কলকাতা।

এর ফল হয়েছে এই যে ভারতবাসীর দেহে শোষক জোঁক এক ভাবেই লেগে আছে। দেহ থেকে ঐ জোঁক ছাড়াবার বদলে আমরা শুধু তার রং বদলে দিয়েছি এবং সাদা জোঁক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। এর ফলে আপনাদের দুঃখ দূর হবার বদলে বেড়ে গেছে। এই জন্যই আজ ভারত স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আপনারা নাজেহাল হচ্ছেন এবং এই স্বাধীনতা স্বরাজ না হয়ে স্বদেশী কুঠিয়াল রাজ হয়ে গেছে। আপনাদের হাতে কিছুই আসেনি।

যতদিন না আপনারা এই সব কুঠির মাল এবং কুঠিয়ালদের শাসন ব্যবস্থা বর্জ্জন করে নিজেদের পর্ণ কুটীরে মাল উৎপাদন করেন ও গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতি স্থাপন করে নিজস্ব রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন; ততদিন আপনাদের মত পর্ণ কুটীরবাসীদের রাজত্ব অর্থাৎ স্বরাজ কায়েম হবে না। এবার আপনারা বুঝতে পারবেন যে কেন গান্ধীজী এত করে বার বার বলতেন যে ঘরে ঘরে চরখা না চালালে স্বরাজ পাওয়া যাবে না।

ইংরেজ এসেছিল ভারতের সম্পদ শোষণ করতে। যে পদ্ধতিতে আপনারা পুকুরের জল সেচের ব্যবহার করেন, সেই পদ্ধতিতে তারা এই শোষণকার্য চালায়। প্রথমতঃ আপনারা পুকুরের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে গর্ত্ত করেন যাতে পুকুরের জল ঐ গর্ত্তে এসে জমা হয়। এরপর আপনারা ডোঙ্গার সাহায্যে ঐ জল সিঞ্চন করে নিজের খেতে পাঠিয়ে দেন। ইংরেজরাও এ দেশের চারিধারে বোম্বাই, কলকাতা, করাচী, মাদ্রাজ আদি বড় বড় সহর রচনা করল। আমলাতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের সহায়তায় ঐ সব সহরে ভারতের দূরতম গ্রামের সম্পদ একত্র করা হত এবং তারপর তা পাঠান হত ইংলণ্ডে। ইংরেজরা এদেশে থাকা কালে এই সব সহরে সমগ্র দেশের সম্পদ টেনে এনে একত্র করা হত এবং অবশেষে তা বিলাতে পাঠান হত বলে সহর গুলির অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ইংরেজ চলে গেছে। এখনও অবশ্য আপনাদের সম্পদ আকর্ষিত হয়ে সহরে যায়; কিন্তু সেখান থেকে তা আর বিলাতে যায় না। এর ফলস্বরূপ সহরের শ্রীবৃদ্ধি

ঘটছে; কিন্তু আপনারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হচ্ছেন। সুতরাং আজ আপনাদের এমন এক নবীন বিপ্লবের প্রস্তুতি করতে হবে যাতে আপনাদের সম্পদ বোম্বাই ও কলকাতায় প্রবাহিত হয়ে না চলে যায়। আর এ শুধু সম্ভব হবে তখনই, যখন আপনারা সহরে প্রস্তুত মাল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবেন এবং হ্যাট কোট মার্কা দেশ শাসন ব্যবস্থার সাথে অসহযোগীতা করবেন। যেমন ভাবে ইংরেজদের জাহাজে চড়িয়ে লণ্ডন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি এইসব হ্যাট কোট মার্কা শাসন ব্যবস্থাকে দিল্লিতে না পাঠান পর্য্যন্ত আপনারা স্বরাজ পাবেন না, অর্থাৎ জনসাধারণের রাজত্ব কায়েম হবে না!

এখন কথা হচ্ছে এই যে এ সব কাজ করবে কে? বন্ধুগণ! আমরা বোধহয় এই নবীন বিপ্লবকে মূর্ত্ত করে তুলতে পারব না। একটা লড়াই আমরা জিতেছি এবং বিদেশী রাজত্বের বদলে স্বদেশীরাজ কায়েম করেছি। এখন তো আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা যা পেয়েছি, স্বভাবতঃ তা ভোগ করার দিকেই আমাদের নজর পড়েছে। নবীন বিপ্লব সাধনের জন্য শক্তি কই? উদ্যম কই? আর তা ছাড়া আমরা হচ্ছি কুঠিয়ালের বংশধর। একবার না হয় ছোট ছোট কুঠি ছেড়ে কাটকা খেলেছি। লাভ অবশ্য মন্দ হয়নি। ছোট কুঠির বদলে বড় কুঠি পেয়েছি। এরপর আমাদের ভরসায় আপনারা আর কতদিন থাকবেন? এখন তো স্বদেশী রাজত্বের বদলে স্বরাজ স্থাপনার্থ এক অভিনব বয়কট ও অসহযোগের কার্যক্রমের নেতৃত্ব নিতে হবে গ্রামের যুব সম্প্রদায়কে।

প্রাচীন কালে দেশবাসীর কল্যাণের জন্য সগর ঘোর তপস্যা

করে ভারতে গঙ্গাবতরণ করিয়েছিলেন। গঙ্গা যাতে পাতালে না যেতে পারে তার জন্য পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট মহাদেব নিজের জটায় তাঁর গতিরোধ করলেন। কিন্তু মহাদেব গঙ্গাধারাকে ভারতভূমিতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থার বদলে তাকে নিজ শ্বশুরালয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন এবং গঙ্গা বহুবৎসর হিমালয়ে আটকে পড়ল। অবশেষে ভারতবাসীদের ভগীরথকে প্রসন্ন করে গঙ্গাবতরণ করাতে হল। গান্ধীজীও এইভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঘোর তপস্যা করে দেশে স্বরাজ প্রবাহের অবতরণ করিয়েছিলেন। অজ্ঞ জনসাধারণের হাতে স্বরাজ যাতে অরাজকতা রূপ গহ্বরে পতিত না হয় তার জন্য পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট আমরা স্বরাজ প্রবাহের গতি নিজেদের টুপিতে অবরুদ্ধ করে তাকে নিজ আত্মীয় স্বজনের ঘরে নিয়ে হাজির করেছি। আপনাদের স্বরাজ ঐখানেই ঘুরপাক খাচ্ছে। এখন আপনাদের ভগীরথের মত প্রযত্ন করে ঐ স্বরাজকে ওখান থেকে মুক্ত করে লক্ষ লক্ষ গ্রামের কোটী কোটী কুটীরে পৌছিয়ে দিতে হবে। এর জন্য গ্রামবাসী যুবকদের আত্মবলি দিতে হবে এবং আপনাদের সকলকে জীবন পণ করতে হবে।

আপনারা কিন্তু এ ভাবে কাজ করছেন না। পঞ্চাশ বছর আগে কংগ্রেসের নরম দল যা করত আপনারাও তাই করছেন। তাঁরা ইংলণ্ডের কাপড়ে তৈরী বিলাতী কায়দার পোষাক পরতেন এবং ইংরেজদের মত খানা পিনা এবং চলন বলন এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতির নকল করতেন। তাঁদের আশা ও আকাঙ্খা উন্মুখ ছিল ব্রিটীশ সভ্যতা গ্রহণ করার জন্য। এর সাথে সাথে আবার

তাঁরা সব ইংরেজদের নিন্দা করতেন এবং শোষণের কারণে দেশের যে দুর্দ্দশা হত তার জন্য তাদের প্রতি দোষারোপ করতেন। বন্ধুগণ! আমি আপনাদের কাছে স্পষ্টভাবে এই কথাটী জানাতে চাই যে যতদিন ধরে দেশবাসী এই ভাবে ব্রিটীশদের গালিগালাজ করে এসেছে, ভারতের রাজ সিংহাসন ইংলণ্ড ছেড়ে এক ইঞ্চিও সরে আসেনি। ভারতের সিংহাসন সেই দিনই সরে দিল্লীতে এসেছিল যে দিন গান্ধীজীর আহ্বানে সহস্র সহস্র যুবক যুবতী স্কুল কলেজ ছাড়ল, আদালত আর কাছারীর সংস্রব ত্যাগ করা হল, সে যুগের কাউনসিল এবং মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিল, নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরদুয়ার ছেড়ে শিয়রে মৃত্যুকে নিয়ে অসহযোগ বয়কট এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর জন্য তারা পিকেটীং করে, লাঠির আঘাত হাসিমুখে বরণ করে, গুলির সামনে বুক এগিয়ে দিয়ে এবং আত্মীয় স্বজনের বিরূপ বাক্য বরদাস্ত করে। তাদের মধ্যে শত শত যুবক মরে গলে পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর আজকের দিল্লীর স্বদেশীরাজ কায়েম হয়েছে!

সেদিনের মত আজকের গ্রামীন যুব সম্প্রদায় ও সহরের কুঠিয়ালদের দ্বারা নির্ম্মিত সহুরে ছাঁট কাটের পোষাক পরিচ্ছদ পরে, খাওয়া দাওয়া ও চাল চলনে তাদেরই অন্ধ অনুকরণ করে। নাগরীক রীতি নীতির অনুকরণ করতে পারলেই তারা মনে করে যে তাদের জীবনের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হল। এর সঙ্গে সঙ্গে আবার সহরের দ্বারা শোষিত হবার জন্য গ্রামবাসীদের যে কষ্ট

হয় তার জন্য তারা সহরবাসীদের নিন্দাবাদ করে। আপনাদের একথা বুঝে নেওয়া দরকার যে আপনারা এদের যতই গালি গালাজ করুন না কেন, এর ফলে স্বরাজ সহরের বড় বড় অট্টালিকা ছেড়ে আপনাদের কুঁড়ে ঘরের দিকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসবে না। যুব সম্প্রদায় যখন আবার স্কুল কলেজ ছাড়বে, কাছারী আদালত বর্জন করবে, আজকের ব্যবস্থা পরিষদ ও মন্ত্রীত্বের মোহ ত্যাগ করবে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে মাথায় শমনের পরোয়ানা বেঁধে গান্ধীজী উচ্চারিত অন্তিম মন্ত্রের সাধনের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করবে এবং বয়কট অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাবে, তখনই স্বরাজ আমাদের পর্ণকুটীরে উপনীত হবে। এর জন্য আপনাদের মরে নিশ্চিহ্ন হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; কারণ স্বদেশী পুঁজিবাদ এবং আমলাতন্ত্র হয়ত আপনাদের উপর দিয়ে বিদেশীদের চেয়েও অধিকতর নিষ্ঠুরতার সাথে দমননীতির রথচক্র চালিয়ে যাবে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশে এক বৈপ্লবীক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ইংলণ্ডের শোষণ পাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভারত তখন আকুলি বিকুলি করছিল। অনন্তকালব্যাপী বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী সন্ত্রাসবাদের পথেই এগোচ্ছিল। তাতে জর্জ্জরিত হয়ে দেশের ডুবে যাবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গান্ধীজীর আবির্ভাব হওয়ায় দেশবাসী তাঁর বয়কট, অসহযোগ ও বহিষ্কারের কার্যক্রম অনুসরণ করে শোষণ বন্ধন থেকে মুক্ত হল। আজও সেদিনের মত দ্বিতীয় এক বৈপ্লবীক পরিস্থিতির

সৃষ্টি হয়েছে। দেশের পর্ণকুটীরগুলি আজ প্রাসাদের শোষণ বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য আকুল। অবিলম্বে আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করে যদি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ অস্ত্র গ্রহণ না করেন, তবে রাশিয়ার ইঙ্গিতে সন্ত্রাসবাদের জোয়ার দেশে বইতে সুরু করবে। তারপর একদিকে দেশ রাশিয়ার ইঙ্গিতে পরিচালিত কাষ্ঠ পুত্তলিকা হবে এবং অন্যদিকে হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘাত প্রতিঘাতে আমাদের মাতৃভূমি জর্জরিত হয়ে যাবে। ভারতকে এই ভীষণ সঙ্কট থেকে ত্রাণ করার জন্য শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় পর্য্যন্ত গান্ধীজী সাতলক্ষ যুবক যুবতীর জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জ্ঞাপন করে গেছেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের যুব-সম্প্রদায় কি এ ডাকে সাড়া দেবে?

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন :— আজ যাঁরা দেশ শাসন করছেন, তাঁরা তো গান্ধীজীর শিষ্য। তা হলে তাঁরা গান্ধীজীর আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করেন না কেন? আমাদের কাছে বিপ্লবের কথা বলার চেয়ে তাঁদের একথা বোঝালে কাজ হত না?

উত্তর :—বোঝালে যদি লোক বোঝে তাহলে গান্ধীজী নিজেই কি বুঝাতে পারতেন না? আমি তো আপনাদের বলেছি যে তাঁদের মগজে বিলাতি শাস্ত্র ঠাসা রয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সমৃদ্ধি ও আড়ম্বর দেখে তাঁদের বোধশক্তি সম্মোহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁদের বোঝান কঠিন। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আপনাদের কাছ থেকে এতদূরে চলে গেছেন যে দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্বন্ধে তাঁদের আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তা ছাড়া আপনারা যে গান্ধীজীর শিষ্যত্বের কথা বলছেন তার স্বরূপও আপনাদের জানা দরকার। গুরুর একাধিক বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে। যার যেটা শেখার দরকার সে সেইজন্য গুরুর কাছে যায়। বর্ত্তমানে কংগ্রেসী সরকারের রাজত্ব চলছে। গান্ধীজীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভাবের আগেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দেশে বিদ্যমান ছিল। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ইংরেজের হাত থেকে দেশবাসীর কাছে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা। কার্য্য সাধনের উপযুক্ত গুণ গান্ধীজীর কাছে ছিল। কংগ্রেস শুধু ঐটুকু পাবার জন্যই গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর সে আগ্রহ মিটে গেল। গান্ধীজী যেভাবে দেশের আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর

পুনর্গঠন চাইতেন, কংগ্রেস তার জন্য তাঁর শিষ্য হয়নি। অতএব কংগ্রেসের নেতৃবর্গ গান্ধীজী কথিত পদ্ধতিতে দেশের আর্থিক ও সামাজিক পুনর্নির্ম্মাণের কাজ করছেন না। দেশের ভবিষ্যত আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন নিজস্ব কল্পনা নেই। সেইজন্য কংগ্রেসীরা ইংরেজ পরিত্যক্ত ব্যবস্থাকে চালিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীজীর জীবিতকালে কংগ্রেসীরা যে চরখার কথা বলতেন তা একে আর্থিক বিপ্লবের বাহন মনে করার জন্য নয়। গান্ধীজীকে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য তাঁরা চরখার নাম নিতেন। গান্ধীজীও আমাদের এ সম্বন্ধে সচেতন করতেন। তিনি বলতেন, "কংগ্রেসীরা কি আর চরখার নীতিতে বিশ্বাসী? তাঁরা তো শুধু আমার খাতিরে চরখাকে বরদাস্ত করে।"

সুতরাং গান্ধীজী পরিকল্পিত আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধন করতে হলে আপনাদের নিজেদেরই কাজে নামতে হবে। অন্য কারও ভরসায় থাকলে ডুবতে হবে।

প্রশ্ন—বর্ত্তমান সরকার যখন জনতার স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করছে না, তখন যারা এ কাজ করতে চায় তাদেরই আমরা শাসনযন্ত্রের পরিচালক নির্ব্বাচন করি না কেন? তাহলে আর পৃথক ভাবে নূতন করে বিপ্লব সাধনের প্রয়োজন থাকবে না।

উত্তর মনে হচ্ছে যে আপনারা অবস্থাটা ঠিকমত বুঝতে পারেননি। আপনাদের নিগ্রহের কারণ এ নয় যে আজ যাঁরা শাসকের আসনারূঢ় তাঁরা আপনাদের হিতৈষী নয়। ব্যাপার হচ্ছে এই যে তাঁরা অবস্থার দাস হয়ে পড়েছেন। আপনাদের

দেখতে হবে যে কোন কোন ক্রিয়ার ফলে আপনাদের এই কষ্ট। আমি আপনাদের ইতোপূর্ব্বে বলেছি যে ইংরেজরা এ দেশকে পুঁজি-বাদী আমলাতান্ত্রিক নিগড়ে আবদ্ধ করে। আজও সে কঠিন শৃঙ্খল পাশ থেকে আপনারা মুক্ত হতে পারেননি। আজ পুঁজিবাদ, আমলাতন্ত্রের স্কন্ধারূঢ় সাম্প্রদায়িকতা এবং শাসনতন্ত্রের বিলীয়মান অশুভ ছায়া দেশের উপর রয়েছে। এই সব শক্তি সক্রিয় থাকা কালীন আপনারা শাসন ব্যবস্থার ঐ চার দেওয়ালের মধ্যে ঢুকলে আপনারাও অবস্থার দাসে পরিণত হবেন। এইজন্য বার বার গান্ধীজী বলতেন যে শুধু পরিচালকের পরিবর্ত্তন সাধন করলে সমস্যার সমাধান হবে না। এর সঠিক সমাধানের জন্য বর্ত্তমান পদ্ধতির রূপান্তর ঘটাতে হবে। তিনি বলতেন যে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের কোন রকম শত্রুতা নেই, বিবাদ শুধু ইংরেজ প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির সাথে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে ব্রিটীশ শক্তির অপসারণের পর কংগ্রেস মন্ত্রীপদে সমাসীন না হয়ে যেন লোক সেবক সঙ্ঘ রূপে একাজে আত্মনিয়োগ করে। শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিড়লা একবার গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন. "আপনি বলেন যে আপনার সারা জীবন যুদ্ধ করে কাটবে। তাহলে ইংরেজরা চলে গেলে আপনি কার সাথে লড়বেন?" অবিলম্বে গান্ধীজী এর জবাবে বলেছিলেন, "তা হলে আমি তোমাদের সাথেই লড়াই করব।" ইংরেজদের পরাজিত করে কংগ্রেস ইংরেজী পদ্ধতির গললগ্ন হয়েছে। ঐ পদ্ধতি এখন সরকার, কংগ্রেস এবং দেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। প্রথম থেকে কংগ্রেস গান্ধীজীর

কথা শুনলে এমন হতনা। এখন অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। এখন তো বিপ্লব ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা ছাড়া আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে জনতার রাজত্ব কখনও সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় না। এ কাজ জনসাধারণকেই করতে হবে। সরকার শুধু এ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ-- অনেকের বক্তব্য হচ্ছে এই যে শাসকদের মধ্যে আজ প্রবল দুর্নীতির স্রোত প্রবাহমান বলে তাদের সরিয়ে আমরা শাসনভার নিলে দুর্নীতির প্রকোপ কমবে। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?

উত্তর ঃ—শাসনযন্ত্রের বর্ত্তমান কর্ণধাররা ঐ পদাভিষিক্ত হবার আগে আপনাদের চেয়ে ভাল না খারাপ ছিলেন? (জনৈক কর্মী— তাঁরা আমাদের মুকুটমণি স্বরূপ ছিলেন)। মণির যখন এই গতি কাঁচের অবস্থা কেমন হবে? সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে জনশক্তির সংগঠন করে আপনাদের ইংরেজ প্রবর্ত্তিত শয়তানি শক্তির সম্মুখীন হতে হবে। সে শক্তির বিলুপ্তি ঘটালে এ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব এবং জনসাধারণ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ও বিলি ব্যবস্থার ব্যাপারে স্বাবলম্বী না হলে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কোন ব্যবস্থার উপঅঙ্গ হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে সে ব্যবস্থার অবসান ঘটানর কথা বলা আত্মপ্রতারণার নামান্তর মাত্র।

প্রশ্ন ঃ—আপনার আদর্শ গ্রামরাজ্যের কল্পনাকে তো দিল্লীর সরকার রূপ দিতে চলেছে। অনেক প্রদেশে গ্রামপঞ্চায়েত স্থাপিত

হয়েছে, বহু গ্রামে সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। তা হলে আপনি আমাদের নতুন করে কি আর করতে বলেন ?

উত্তর ঃ—এ পঞ্চায়েতে আপনাদের কাজ হবে না। কারণ এর উপরও সেই শয়তানি শক্তির ভর হবে। তা ছাড়া এ পঞ্চায়েতও তো আসছে সেই কোট পাৎলুন পরা হাতির পিঠে চড়ে। হাতিকে খাওয়াতে পারলে পঞ্চায়েত রইল। বিশ ত্রিশ বছর আগে লণ্ডন থেকে পার্শ্বেল হয়ে যেমন এদেশে কাউনসিল ও মন্ত্রীত্ব আসত তেমনি দিল্লী থেকে এই সব পঞ্চায়েতের আমদানী হচ্ছে। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং চিন্তামণি আদি দেশভক্ত নেতৃবৃন্দ সেই মন্ত্রীমণ্ডলে যোগদান করে অবশ্যই দেশের কিছু হিতসাধন করতেন; কিন্তু তাকে আমাদের স্বাধীনতা বলতে পারিনি। তাই আপনাদের মধ্যে যাঁরা দেশভক্ত তাঁরা এই সব পঞ্চায়েতে যোগদান করে গ্রামের কিছুটা উপকার করতে পারবেন; কিন্তু তাকে আপনাদের স্বরাজ বলা চলবে না।

এর পর আসে সমবায় সমিতির ব্যাপার। এর কথা না তোলাই ভাল। গ্রামে গ্রামে আজ যে সমবায় সমিতি চলে তার মূলে কি সমবায় মনোবৃত্তির চিহ্ন আছে ? এগুলি তো ঐ সব বোম্বাই কলকাতায় উৎপন্ন পণ্য বণ্টনের এজেন্সি ছাড়া আর কিছু নয়। এ ভাবে সমবায় বা সহযোগীতার মনোভাবের বিকাশ হতে পারে না। পণ্যের মধ্যে সহযোগীতা হয় না, সহযোগীতা চলে মানুষে মানুষে। মানুষের পারস্পারিক সহযোগীতার একটা আধার দরকার; কারণ হাওয়ায় তো আর সহযোগীতা হয় না। সমবায়

সমিতির প্রতিটী সদস্য সমিতির কোন কাজে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করলে সহযোগীতার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না। একশত গ্রামবাসী একযোগে না চিনি আনতে পারে, না সে চিনি বণ্টন করতে পারে। সুতরাং এ গুলির পরিচালনার ব্যাপারে সকল সদস্যের সম্মিলিতভাবে কিছু করার সুযোগ নেই। সহযোগীতা ভাবের বিকাশ হওয়া সম্ভব শুধু উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। অতএব দেশের অর্থ ব্যবস্থা গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত সহযোগীতার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না।

বস্তুতঃ মানুষের মানসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদি সকল বৃত্তি দেশের আর্থিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত; কারণ সাধারণ মানব নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আপাত প্রয়োজনীয় বস্তুর অভিমুখেই ধাবিত হয়। বিবেকের নির্দ্দেশে এ সব প্রবৃত্তির পরিচালনা করতে পারে অল্প কয়েকজন সুধী। স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে কুটীর শিল্প দেশে চললে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রত্যেককে পারস্পারিক লেনদেন করতে হবে। তারপর স্বার্থের খাতিরে পারস্পারিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। এই সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্বভাবতই সহযোগীতা, ভালবাসা, বিশ্বস্ততা, সদ্ভাব আদি বৃত্তির অনুশীলন করতে হয়। এর পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীত শ্রমশিল্প চালালে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন পূর্ত্তি হবে কেন্দ্র থেকে সরবরাহ দ্বারা। ফলে প্রত্যেকে চাইবে সে যেন ভাল মালটী সর্ব্বাগ্রে পায়। সুতরাং তার প্রয়োজন তাকে প্রতিবেশীর সাথে প্রতি-

দ্বন্দ্বিতার পথে ঠেলে নিয়ে যাবে এবং এর জন্য ধাপ্পা দেওয়া, অন্যায় চাপ দেওয়া আদি দুর্গুণের অনুশীলন করতে হবে। তা হলে সহযোগীতার বিকাশ হবে কি করে?

প্রশ্ন ঃ—স্বরাজের পঞ্চায়েত কেমন হবে? যাই হক না কেন, রাজশক্তি আয়ত্বাধীন না হলে এর মর্য্যাদা কি রকম হবে?

উত্তর ঃ—এর অধিকারের সনদ দিল্লী থেকে আসতে পারে; তবে তা আসবে অন্য পন্থায়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন থেকে যে মন্ত্রীত্ব এসেছিল তার কোন মূল্য ছিল না। গান্ধীজীর নাম নিয়ে আমরা সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুললাম। সে সংগঠনের জন্য আমাদের লণ্ডন থেকে সনদ আনতে হয়নি। কংগ্রেসের মারফত একদিকে আমরা অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলন চালালাম এবং অন্যদিকে সরকারী অধিকার ছাড়াই দেশের দুঃখ মোচনের দায়িত্ব নিলাম। দেশের কোথাও প্লেগ বা কলেরার মত মহামারি দেখাদিলে কংগ্রেস, বন্যা ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মাঝে কংগ্রেস, ধনীক কর্ত্তৃক দরিদ্র শোষিত হলে কংগ্রেস—অর্থাৎ দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের ভার নেবার জন্য কংগ্রেস উন্মুখ থাকত। এর ফলে দেশে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষকে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিতে হল। আজ আপনারা যে স্বরাজ পেয়েছেন তার আইন ও লণ্ডনের পার্লামেণ্টে প্রণীত হয়। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের মন্ত্রীত্ব দিয়েছিলেন আর আজ আমরা তাদের কাছ থেকে মন্ত্রীত্ব আদায় করেছি। এই ভাবে আজ আপনারা যে পঞ্চায়েত পেয়েছেন তার বিশেষ

মূল্য নেই। কিন্তু আপনারা যখন গ্রামে গ্রামে নিজ প্রেরণা ও নেতৃত্বের শক্তিতে সংগঠন সৃষ্টি করে তার দ্বারা পুঁজিবাদী পণ্য এবং আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি বয়কট করবেন এবং গ্রামের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব নিজেদের উপর নেবেন, তখন আপনারা এতখানি গ্রাম শক্তির সংগঠনে সমর্থ হবেন যে এর দ্বারা দিল্লী থেকে অধিকার আদায় করতে পারবেন। তখনকার সে অধিকার হবে আপনাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, আজকের মত দান নয়।

প্রশ্ন ঃ—আপনি ইনসপেক্টরদের বিছানাপত্র বেঁধে দিল্লী পাঠাতে বলছেন। কিন্তু সরকার এ সব ব্যবস্থা না করলে কাজ কি করে চলবে ? আপনার স্বরাজের তাৎপর্য্য কি ? এমন অবস্থা কি ঘটা সম্ভব যে দিল্লীর রাজদণ্ডের চিহ্নই থাকবে না।

উত্তর ঃ—গান্ধীজী বলতেন যে পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে দিল্লীর প্রভাব বিহীন রাজ্য হচ্ছে জ্যামিতির বিন্দুর মত। মনে বিন্দুর ধারণা করা সম্ভব কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জ্যামিতিক সংজ্ঞানুযায়ী বিন্দু অঙ্কন সম্ভব নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে আমরা যেন এর যথাসম্ভব কাছে পৌছাতে পারি। বস্তুতঃ যতদিন লোকের মনে হিংসা ও স্বার্থের লেশ মাত্র থাকবে, ততদিন অল্পাধিক মাত্রায় কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা থাকবেই। সত্যি কথা বলতে কি কিঞ্চিদধিক মাত্রায় কেন্দ্রীয় শাসন রাখতেই হবে, নচেৎ স্বতন্ত্রতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দেশের কাজ কর্ম্ম কি ভাবে চলবে, সকল কাজের প্রেরণার উৎস কে হবে এবং দেশের যাবতীয় ব্যাপারের মূল

দায়িত্ব কার উপর বর্ত্তাবে ? যদি মূল প্রেরণা, নেতৃত্ব এবং দায়িত্ব স্বাধীন জনসাধারণের হয় এবং শুধু প্রয়োজন বোধ করলে সরকারী সাহায্য নেওয়া হয় তা হলে তাকে গণতান্ত্রিক বা স্বরাজী পদ্ধতি বলা চলে। আর প্রেরণা ও দায়িত্ব যদি সরকারের হয় এবং আবশ্যক ক্ষেত্রে শুধু জনসাধারণের সহায়তা নেওয়া হয়, তাহলে তাকে কেন্দ্রবাদী পদ্ধতি আখ্যা দিতে হবে। প্রেরণা ও দায়িত্ব আপনাদের হলে গ্রামে গ্রামে তখন আর আপনাদের জন্য গণ্ডা গণ্ডা ইনসপেক্টরের দরকার কি ? তখন আপনারা নিজ দায়িত্বে কাজ করতে থাকবেন এবং প্রয়োজন বোধ করলে সরকারী গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষণ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

প্রশ্ন ঃ—আপনি সমবেতভাবে গ্রামরাজ্য স্থাপনের কথা বলছেন। কিন্তু গ্রামেও তো অনেক শোষক আছে। তাদের অবস্থা কি হবে ? আমাদের তো তাদের সাথেও সংগ্রাম করতে হবে।

উত্তর ঃ—বিদেশী শোষকদের সাথে লড়ার সময় অনেকে গান্ধীজী-কেও এই কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁরা বলতেন, "আপনি ইংরেজদের সাথে না হয় লড়ছেন; কিন্তু দেশের ভিতরেই যে সব দেশীয় রাজন্যবর্গ রয়েছেন, তাঁরা তো ইংরেজদের চেয়েও বেশী অত্যাচার করছেন। এই অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাদের সঙ্গে আরও তীব্রভাবে লড়াই করা।" গান্ধীজী বুঝে নিয়েছিলেন যে দেশীয় রাজ্য সমূহের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। ওগুলি ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের দালাল ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি তাই জবাব দিয়েছিলেন যে ইংরেজ রাজত্বের অবসানের পর দেশীয়

রাজ্য সমূহ তাসের কেল্লার মত ভেঙ্গে পড়বে। সে সময় লোকে গান্ধীজীর একথা বুঝতে পারত না। আজ কিন্তু একথা সকলে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখছে। আপনাদের এই সব গ্রাম্য শোষকরাও হচ্ছে পুঁজিবাদ এবং সহুরে ব্যবস্থার এজেণ্ট। মূল দোকান বন্ধ করে দিলে এই সব এজেণ্ট আর কোথায় থাকবে ? তখন এই সব ছোট ছোট গ্রামীন দেশীয় রাজ্য তাসের কেল্লার মত চুরমার হয়ে যাবে। সুতরাং এর সম্বন্ধে খুব বেশী মাথা না ঘামিয়ে আপনারা বাইরের শোষণ থেকে মুক্ত হবার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

প্রশ্ন :—আপনি কুঠিয়ালদের রাজত্বের কথা বলছেন। কিন্তু পুঁজিপতিদের শোষণ তো কলকারখানা গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করলে বন্ধ হতে পারে। সমাজতন্ত্রী নেতৃবর্গ আমাদের এর সুন্দর পদ্ধতি দেখিয়েছিলেন। আপনারা ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করেন না কেন ?

উত্তর :—রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা পুঁজিপতিদের শোষণ অবশ্য বন্ধ হতে পারে। কিন্তু এ পথে আপনাদের বা দেশের সমস্যার নিরাকরণ হবে না এবং মানব সমাজের সুপ্রাচীন শোষণ পদ্ধতিরও পরিসমাপ্তি ঘটবে না। কলকারখানার পদ্ধতি বজায় রেখে যদি তার রাষ্ট্রীয়করণ করাও যায়, তা হলেও পুঁজি এবং বেকারত্বের সমস্যা থেকে যাবে এবং এর সমাধান প্রায় অসম্ভব ব্যাপারের পর্য্যায়ে যেয়ে দাঁড়াবে।

শুধু রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা মানব সমাজের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট দূরীভূত হতে পারে না। উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে পুঁজিপতিকে যদি সরিয়েও দেওয়া যায় তাহলে

এই কেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনের জন্য পুঁজিপতিদের বদলে একটী দলের দলপতি আমদানী করতে হবে। দলপতির স্বরূপ যে কেমন তার অল্পবিস্তর পরিচয় আপনারা পাচ্ছেন। আমার আর বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই। খবরের কাগজ এবং পুস্তকাদির সাথে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা রাশিয়া আদি অন্যান্য দেশের অবস্থাও কিছু কিছু জানেন। জনসাধারণের বুকে পুঁজিপতি বা দলপতি যেই বসুক না কেন, তাদের অবস্থার কিছু তারতম্য হয় না। বরং বিতরণের জন্য বেনিয়াতন্ত্র এবং ব্যবস্থার জন্য আমলাতন্ত্র দুটী পৃথক ব্যবস্থা হলে এদের পারস্পারিক সংঘর্ষের জন্য কখনও কখনও আপনারা কিছু লাভবান হতে পারেন; কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণের ফলে বিতরণ এবং ব্যবস্থা দুই আমলাতন্ত্রের হাতে চলে যায় বলে আপনাদের সে লাভ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। বস্তুতঃ জনসাধারণের বুকের উপর যখন পুঁজিপতি চড়ে বসে তখন জনসাধারণ অন্ততঃ দুঃখের জন্য অভিযোগ জানাতে পারে ও একটু আহা উহু করতে পারে। কিন্তু তাদের বুকে দলপতি সওয়ার হলে তাদের আর টুঁ শব্দ করার উপায় থাকে না।

অনেকে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার জন্য অবশ্য শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের কথা বলে থাকেন; কিন্তু তাঁদের পুঁজিবাদের স্বরূপ বুঝতেই ভারি ভুল হয়। পুঁজিবাদের অর্থ পুঁজিপতি নয়, উৎপাদনের বিশেষ এক পদ্ধতি। জনসাধারণকে যদি জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্য দ্রব্যরাজির জন্য পুঁজির উপর নির্ভরশীল হতে হয়, তাহলে তাকে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা বলা হয়। বস্তুতঃ পুঁজি

এবং শ্রম উভয়বিধ সাধন দ্বারাই উৎপাদন করা চলতে পারে। উৎপাদনের মূখ্য এবং আধারভূত সাধন পুঁজি হলে তাকে পুঁজি-বাদ এবং শ্রম হলে তাকে শ্রমবাদ বলা হবে। শুধু পুঁজিপতিকে সরিয়ে দিলেই পুঁজিবাদের বিনাশ ঘটবে না। আপনারা যখন পুঁজির গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে শ্রমের ভিত্তিতে নিজ প্রয়োজন পূর্তি করবেন, তখনই কেবল পুঁজিবাদের অবসান ঘটবে। আর শুধু গান্ধীর চরখার দ্বারাই এ সম্ভব।

আসল প্রশ্ন হচ্ছে মূলীভূত শোষণের। একে বুঝতে হলে আপনাদের শোষণের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। মানব সমাজের প্রথমাবস্থায় কেউ কাউকে শোষণ করত না। শোষণের এই রেওয়াজ পরে আরম্ভ হয়। আপনারা বিড়াল ও বাঁদরের গল্প শুনেছেন। দুই বিড়াল এক টুকরা রুটী জোগাড় করেছিল। নিকটস্থ গাছে ছিল এক বাঁদর। সে বিড়ালদের রুটী ভাগ করার ব্যবস্থায় লেগে গেল। তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে দেখা গেল যে বিড়ালদের জন্য আর কিছু নেই। এইভাবে সমাজের বিলি ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ রাজ্য ও রাজার সৃষ্টি করল। অর্থাৎ সমাজে এক বানর জাতির জন্ম হল। রাজ্যের তরফ থেকে সমগ্র দেশের বিলি ব্যবস্থা করার বাহানায় এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে মানুষ কলকারখানার আবিষ্কার করে কেন্দ্রিত শ্রমশিল্প গড়ে তুলল। এ প্রথা প্রবর্তিত হবার পূর্ব্বে সমাজে উৎপাদক ও উপভোক্তা নামক দুটী মাত্র শ্রেণী ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রিত হওয়ার ফলে বিতরণের জন্য তৃতীয়

একটী শ্রেণীর উদ্ভব হল। অর্থাৎ বিতরক নামে সমাজে এক নবীন বানর শ্রেণীর সৃষ্টি হল। আপনারা জানেন যে তুনিয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের মধ্যেই সম্পর্ক থাকতে পারে। তৃতীয় পুরুষের স্থান কোথাও নেই। এইজন্য বিতরণ ব্যবস্থায় অব্যবস্থা দেখা দিলে জনসাধারণ বিতরকদের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য ব্যবস্থাপক শ্রেণীর কাছে হাজির হয় এবং এইভাবে পণ্যের যথাযথ বণ্টনের নামে ব্যবস্থার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। এইভাবে বিশ্বে আজ ব্যবস্থাপক এবং বিতরকরূপী বানর জাতি উৎপাদকরূপী বিড়াল জাতির কাঁধে চড়ে বসেছে। এই কারণেই মানব জাতি আজ হুজুর ও মজুর নামক তুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটী শোষক ও অপরটী শোষিত। শোষণের অবসান ঘটাতে হলে সারা হুজুর বংশকে নির্ব্বংশ করতে হবে। রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা পুঁজিপতিরূপী বড় হুজুরের প্রতাপ শেষ হলেও ব্যবস্থাপক ও বিতরকরূপী ছোট হুজুরদের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তু চারটে হুজুরকে শেষ করে অসংখ্য ছোট হুজুরের সংখ্যা বাড়িয়ে আপনাদের আর কি লাভ? গান্ধীজী বর্ণিত পন্থানুসরণ করে আপনারা যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার উৎপন্ন করা ও আভ্যন্তরিক বিলি ব্যবস্থা করার ব্যাপারে স্বাবলম্বী হন, তাহলে এই ছোট বড় তুই শ্রেণীর হুজুরের হাত থেকেই মুক্তি পাবেন।

প্রশ্ন :—কিন্তু কোন কোন জিনিষ তো কেন্দ্রিত উপায়ে উৎপন্ন করতেই হবে। সে ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে?

উত্তর :—সমবায় সমিতি দ্বারা সেগুলির পরিচালন হতে পারে

এবং এর জন্য আপনারা কিছু বানর পুষতে পারেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত কম হবে যে তারা বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হবে না।

প্রশ্ন ঃ অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে দলপতি যদি থাকেই তবে তাতে আর ক্ষতি কি ?

উত্তর ঃ—লাঙ্গল, বলদ এবং চরখা তাঁত গ্রহণ করলেও যখন অন্ন বস্ত্র মিলবে তখন দলপতিকে বুকের উপর বসাবার প্রয়োজন কি ? তা ছাড়া মানুষের আকাঙ্খা কি অন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত সীমিত ? স্বাধীনতাও মানবের পক্ষে এক অতীব প্রয়োজনীয় জিনিষ। স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সক্ষম না হলে মুক্তির স্বাদ পায় না। গান্ধীজী এই জন্যই বলতেন যে ইংলণ্ড, আমেরিকা রাশিয়া, জার্ম্মাণী আদি কোথাও স্বরাজ স্থাপিত হয়নি। গান্ধীজীর কাছে স্বরাজের এক পৃথক সংজ্ঞা ছিল। তিনি বলতেন যে দেশের কিছু সংখ্যক লোক শাসন ক্ষমতা পেলে স্বরাজ হয় না। বরং প্রত্যেকটী লোকের মধ্যে যখন ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শক্তি জন্মে, তাকেই সত্যকার স্বরাজ বলে। জনসাধারণকে যদি জীবধারণোপযোগী দ্রব্য সমূহের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল হতে হয়, তবে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ করার শক্তি থাকতে পারে না। কথায় বলে "যার সরষে তার তেল।" ছেলেবেলায় একটী গল্প শুনেছিলাম। কোন রাজকুমার এক রাক্ষসদের রাজত্বে হাজির হয়েছিল। রাজকুমার শুনেছিল যে সে দেশের সরোবরের মাঝখানে যে কাঠের খুঁটী আছে, তারই মধ্যে আছে এক সোনার ডিবে

এবং ঐ সোনার ডিবের মধ্যে যে ভ্রমর তার পেটেই আছে সমস্ত রাক্ষসের প্রাণ। রাজকুমার সেই ভ্রমরকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে রাক্ষসের উপর রাজত্ব করতে লাগল। প্রতিটী রাক্ষসের দেহে এমন শক্তি ছিল যে এক গ্রাসেই তারা রাজকুমারকে খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু প্রাণের ভয়ে তাদের রাজকুমারের শাসন মেনে নিতে হল। আপনারা যদি বোম্বাই ও কলকাতার পুঁজির পেটে নিজ প্রাণ বন্ধক রাখেন, তাহলে যে ঐ পুঁজি দখল করতে পারবে সে আপনাদের উপর স্বৈরতন্ত্রী শাসন চালাবে। সে অবস্থায় যতই ক্ষমতার দুরুপযোগ হ'ক না কেন, আপনাদের চুপ করে থাকতে হবে। স্বাবলম্বনের পথে, ভাত, কাপড়, স্বরাজ সবই পাবেন। অন্য পদ্ধতিতে কিছুতেই আপনাদের উদ্দ্যেশ্য সফল হবে না।

প্রশ্ন :—কিন্তু আজ তো দেশে নানা দ্রব্যের জন্য হাহাকার উঠেছে। কলকারখানা ছাড়া উৎপাদন বাড়বে কি করে? তা হলে আপনি কেন বলছেন যে লাঙ্গল বলদ এবং চরখা তাঁত চালিয়ে ভাত কাপড় পাওয়া যাবে?

উত্তর :—আপনারা যাতে মিল মালিকদের মুখাপেক্ষী হন এইজন্য তারা আপনাদের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ে। আসল কথা আমি আগেই বলেছি যে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ার বদলে বেকারত্ব বাড়ে। ঢেঁকি চালালে হয়ত এক মণ ধান থেকে সাতাশ সের চাল হবে। ধান কল খুললে কি আর তুষের অংশ কমে চাল বেড়ে যাবে?

জাঁতায় বা কলে যাতেই পেষাই করুন না কেন, এক মণ গমে এক মণ আটাই হবে। বরং কলে পেষাইএর ফলে কিছুটা আটা জ্বলে নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে দশ সের কাপাস থেকে যদি কুড়ি নম্বরের সূতার কাপড় তৈরী করতে হয়, তাহলে চরখা আর তাঁতে যতটুকু কাপড় হবে মিলে তার চেয়ে তো বেশী কাপড় হবেই না বরং মিলে কিছুটা তুলা উড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিলে জানতে পারবেন যে ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্য করলে উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; বরং বেশী দিন এর ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারবেন যে কলকারখানায় পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, এতে শুধু উৎপাদন দ্রুত গতিতে হয়—অর্থাৎ লোক কম লাগে। আর একটু তলিয়ে যদি ভেবে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে কলকারখানার প্রসারের সাথে সাথে অন্ন বস্ত্রের জন্য হাহাকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কমেনা মোটেই।

নিজের খেতে ধান চাষ করে ঘরেই ঐ ধান কুটে নিলে চাল তৈরীর সমস্ত কাজ এক যায়গাতেই হয়। কিন্তু ঐ ধান কলে পাঠিয়ে সেখান থেকে চাল করে আনতে হলে আপনাদের ধান পাঠান ও চাল আনার জন্য কয়েকটী নূতন ব্যবস্থা করতে হয়। অর্থাৎ বস্তা জোগাড় করতে হয় ও মাল চলাচলের গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে হয়। অতএব কলকারখানার প্রসারের সাথে সাথে প্যাকিং এর জিনিষ এবং যাতায়াতের ব্যবস্থারূপী দুটী নূতন সমস্যা দেখা

দেয়। এ সব জিনিষের কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় মাটীতে। সুতরাং পাট আদি নূতন জিনিষের প্রয়োজনীয়তার জন্য আপনাদের ধানের খেতের খানিকটা তার দখলে যাবে। ক্রমশঃ বড় বড় সহরের সৃষ্টি হবার জন্য গায়ে মাখা সাবান, স্নো, ক্রিম, জুতার পালিশ, চা, কফি, মিষ্টি খাবার এবং পান, বিড়ি, সিগারেট আদি অনেক রকমের অদরকারী জিনিষ আমাদের প্রয়োজনের তালিকায় এসে পড়ে। এইজন্য আপনারা আপনাদেরই জীবদ্দশায় লক্ষ্য করছেন যে বাঙলার ধানের খেত কত দ্রুত গতিতে পাটের জমিতে পরিণত হচ্ছে, দক্ষিণ ভারতের ধানের খেতে নারিকেলের চাষ হচ্ছে, অন্ধ্রের ভাল ভাল জমিতে তামাক লাগান হচ্ছে এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের প্রথম শ্রেণীর জমি চলে যাচ্ছে আখের কবলে। ঠিকই আছে। কোন যায়গাকে উঁচু করতে হলে একটা যায়গাকে তো গর্ত্ত করতে হবে। সমাজের উপরের স্তরকে উঁচু করতে হলে তো পেটে গর্ত্ত করতে হবেই।

সহরের প্রসারের জন্য ইট পোড়ানর জ্বালানি, আসবাব পত্রের জন্য কাঠ এবং ঘরে ঘরে নিরন্তর উনান জ্বালার জন্য যে সব কাঠ চাই তার জন্য বন সম্পদের উপর যে চাপ পড়ে এবং তার ফলে যে অনাবৃষ্টি ও বন্যার প্রকোপ বাড়ে তাকে শিল্পীকরণের এক অতিরিক্ত আশীর্ব্বাদ মনে করা যেতে পারে। এই ভাবে আপনারা যতই ভেবে দেখবেন বুঝতে পারবেন যে কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বলে যে মায়াজাল ছড়ান রয়েছে তা এক ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন ঃ—তা হলে আপনার কল্পিত সমাজে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে কলের কি কোন স্থান নেই? যদি মেশিনের স্থান কোথাও থাকে তবে তার সীমারেখা কোথায় টানবেন?

উত্তর ঃ—কে বলল মেশিনের কোন স্থান নেই? চরখা, তকলি সবই তো মেশিন। আমি যে যারবেদা চরখায় সূতা কাটছি তাও মেশিনের মত দেখতে।

মানুষের হাতকে যতটুকু সাহায্য দেয়, মেশিনের মর্য্যাদা ততটুকু। হাতকে বেকার করতে সুরু করলেই মেশিনকে আমাদের পরিকল্পনা থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে। স্বাবলম্বী সমাজে অন্য ভাবেও মেশিনের ক্ষেত্রকে সীমিত করতে হবে। এ সীমারেখা হচ্ছে স্বরাজের। মেশিনের দ্বারা যদি জনসাধারণকে পুঁজি বা বিশেষজ্ঞরূপী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অথবা কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থার গোলাম হয়ে পড়তে হয় তাহলে তার ফলে স্বরাজ খর্ব্ব হবে। অতএব সর্ব্বদা মেশিনে বাছাই করার সময় এই সীমারেখার কথা স্মরণ রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইংরাজী শিক্ষিতদের খুবই সমালোচনা করেছেন। তাহলে লেখাপড়া শেখা কি পাপ? লেখাপড়া করলে পরাধীন মনোবৃত্তি কি ভাবে হয়?

উত্তর ঃ—লেখাপড়া শিখলে গোলাম মনোবৃত্তি হয় না। মানুষ যদি স্বাধীন চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বাধীন ভাবে চলে এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য অপরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার

বিবরণ পড়ে তবে তাকে গোলাম বলা উচিত না। কিন্তু আপনারা যে সব লেখাপড়া জানা লোক দেখছেন, তারা সব শাস্ত্র গলাধঃকরণকারী। তাঁদের সমস্ত বিদ্যা পুঁথিগত। তাঁদের যদি কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েও থাকে তবে তা হয়েছে বইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বা তার অনুকরণ করে। আর তা ছাড়া আমি লেখাপড়া জানা লোকদের কথা বলিনি। আমি ইংরাজী পদ্ধতিতে শিক্ষিত লোকদের কথাই বলেছি। এদের শিক্ষা পদ্ধতির আধারই দাসত্বের উপর। আপনারা যে সমস্ত বি এ, এম এ পাশ লোক দেখেন তাদের দাসত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। লর্ড মেকলে নামক জনৈক ইংরাজ হচ্ছেন এই শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। স্পষ্ট ভাষায় তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে শিক্ষার দ্বারা তিনি দাসত্বের সাধন তৈরী করতে চান। এই সব শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু যে শাস্ত্রের সূত্র ও টিকাটিপ্পনীর গোলাম তাই নয়, তারা ইউরোপ ও আমেরিকার সব কিছুরও গোলাম। ইউরোপ এবং আমেরিকাবাসীরা যা কিছু বলেন তাই তাঁদের কাছে ধ্রুব সত্য। একটী মজাদার গল্প বলছি। এক গ্রামের এক জমিদার নিজের ছেলেটীকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। ছেলেরা ঠিকমতন লেখাপড়া শিখছে কি না এ জানার জন্য তাঁর খুব ব্যগ্রতা ছিল। একদিন তাঁর ছোট ছেলে পড়ছে ডি ও জি ডগ, ডগ মানে কুকুর। জমিদারবাবু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন এই কি পড়ছিস ? ছেলেটী পড়ার পুনরাবৃত্তি করল।

জমিদারবাবু—এ পড়া তোকে কে শিখিয়েছে ?

ছেলে—মাষ্টার মশায়।
জমিদারবাবু—মাষ্টার মশায় কতদূর পড়াশুনো করেছেন?
ছেলে—নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত।
জমিদারবাবু—আরে একি আজে বাজে পড়তে দিয়েছে? এ সব ভুল, ঠিক করে পড়।

ছেলেটীর দাদা এ সব শুনছিল। সে ভাইকে বলল, "দেখ কাল যখন বাবা রোদে বসে তামাক খাবেন সেই সময়ে তাঁর কাছে বসে তুই পড়বি—ডি ও জি ক্যাট, ক্যাট মানে ইঁদুর। আর বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন যে মাষ্টার মশায় কতদূর পড়াশুনো করেছেন তখন বলবি যে তিনি বিএ পাশ।"

ছোট ছেলে তাই করল এবং যখন সে বলল যে মাষ্টার মশায় বি এ পাশ তখন জমিদারবাবুর মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং ছেলেকে তিনি স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার সব ঠিক হয়েছে। পড় পড় বাবা পড়।"

আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের হচ্ছে এই দশা। গান্ধীজীর কথা মনে ধরে না। তাঁদের কাছে ইউরোপ আমেরিকার লোক হচ্ছে বিএ, এম এ পাশ। গান্ধীজী যখন বনিয়াদী শিক্ষার কথা বললেন তখন তা মনে লাগল না; কিন্তু বি এ, এমএ পাশ করা লোকেরা বলার পর তা ঠিক হয়ে গেল। এরই নাম হচ্ছে গোলামী মনোবৃত্তি।

প্রশ্ন :—আপনি রাশিয়া এবং আমেরিকাকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করছেন। আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত; কিন্তু

রাশিয়ার কার্য্যকলাপ অপর দেশকে শোষণমুক্ত করার জন্য নিয়োজিত।

উত্তর ঃ—দুশো বছর আগে যখন প্রথম ইংরেজদের রাজত্ব সুরু হোল তখন তাদের সম্বন্ধে লোকের মুখে ঠিক এই কথাই শোনা গিয়েছিল। সে সময়ে ওলন্দাজ এবং ফরাসী যা কিছু করত সবই ছিল স্বার্থের জন্য এবং ইংরেজদের প্রতিটী ক্রিয়া কলাপ ছিল সুমহান আদর্শ ও ন্যায়ের জন্য। বিশ্বের উৎপীড়িত মানব জাতি এই আদর্শবাদী ন্যায়প্রেমী ইংরেজদের খোলা মনে স্বাগতঃ জানাল, কিন্তু কালে প্রত্যেকের স্বরূপ প্রকাশ পেল। এরা উভয়েই ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শোষক। তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজরা কূটবুদ্ধি সম্পন্ন এবং অন্যান্য সকলের সে রকম তীক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল না।

আপনারাও সেই রকম কথা বলছেন। আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। উভয়েই স্বৈরতন্ত্রী গণনিপীড়ক। আজকাল এর একটীকে বলা হয় দক্ষিণপন্থী এবং অপরটীর নাম বামপন্থী। দুইটী রাষ্ট্রই বিশ্বে একনায়কত্ব চালাতে চায়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে একজন চালাক ও অপরজন বোকা। কিন্তু দু'শ বছর আগে বিশ্ববাসীর মনে ইংরেজদের সম্বন্ধে যে রকম ভ্রান্ত ধারণা ছিল আপনাদের মনেও, এই দুই শক্তির সম্বন্ধে সে রকম ভুল ধারণা বিদ্যমান। এই জন্যই আপনাদের মনে হচ্ছে যে ইংরেজ ও আমেরিকা যা কিছু করছে সব স্বার্থের জন্য এবং রাশিয়া যা করছে তা সব এক মহান আদর্শ ও সাম্য স্থাপনের জন্য।

প্রশ্ন ঃ—গান্ধীজী কেন কণ্ট্রোলকে পাপ মনে করতেন?

উত্তর ঃ—মূখ্যতঃ খাদ্য শস্যের উপরেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল বেশী। তার সাথেই আপনাদের বেশী সম্বন্ধ। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারি রাখার জন্য কার্যক্ষেত্রে অনেকগুলি দোষ এসে পড়ে; কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন অনুযায়ী আমি শুধু এর নৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করব। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় চোরাবাজার ত বন্ধ হয়ইনা বরং আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বেড়ে যায়। কথায় বলে গোদের উপর বিষফোঁড়া। জনসাধারণের অবস্থা হয়েছে সেই রকম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে আপনারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এজন্য চান যে এর দ্বারা সহরবাসীরা অর্থাৎ যাদের কাছে কৃষিযোগ্য ভূমি নেই তাদের চোরা বাজারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু সহরের বাবুদের কাছে যেমন জমি নেই তেমনি গ্রামের অসংখ্য শ্রমিকেরও জমি নেই। মোট ভূমিহীন দেশবাসীর বোধহয় শতকরা তিরিশ জন মাত্র সহরবাসী বাবু, বাকী সত্তর জনের কি হবে? আর এই সত্তর জন ঐ সব বাবুদের চেয়ে অনেক বেশী গরীব ও দুঃস্থ। তাহলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা শুধু এই শতকরা ত্রিশ জন অবস্থাপন্ন দেশবাসীকে সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্বদেশী রাজত্বে আপনাদের মত কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দাদের আর কি মূল্য? তারপর এই সব বাবুদের জন্য যে খাদ্য শস্য সংগৃহীত হয় তা আসে কোথা থেকে? গ্রামে যখন সরকারী খাজনা আদায় হোতনা তখন চাষীরা মজুরদের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শস্য দিত। কিন্তু খাজনা আদায়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হবার পর তারা পারিশ্রমিক পয়সায় দেওয়া সুরু করল। সেই সব শ্রমিক

পয়সা দিয়ে চোরাবাজার থেকে খাদ্য কিনতে বাধ্য হল। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে সরকার যে খাদ্যশস্য গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেন তা হচ্ছে ভূমিহীন কৃষকদের মুখের গ্রাস। এই ভাবে তাদের ক্ষুধার অন্ন ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আপনারা মুখে স্নো পাউডার প্রলেপ-কারী এবং নিত্য সিনেমা দর্শনাভিলাষী বাবুদের চোরাবাজারের হাত থেকে রক্ষা করে গরীব কৃষি শ্রমিকদের সেই রাক্ষসের মুখের সামনে ঠেলে দিচ্ছেন। এটা পাপ ছাড়া আর কি?

প্রশ্ন :—তাহ'লে সহরে যে সব শ্রমিক আছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রদ হয়ে গেলে তাদের কি হবে?

উত্তর :—আজ সরকার যে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করছেন তা প্রথমে এদের দিয়ে উদ্বৃত্ত থাকলে অপরকে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

প্রশ্ন :—আপনি অসহযোগ বয়কট এবং সত্যাগ্রহের কথা বলছেন, এদের মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : – অসহযোগ এবং বয়কট প্রায় একই জিনিষ। শুধু কার্য পদ্ধতির খুঁটিনাটী তফাৎ আছে। প্রথম পদবিক্ষেপে আসে অসহযোগ। যে সব ব্যাপারে স্বেচ্ছায় সহযোগীতা করা হয় তা বর্জন করার নাম হচ্ছে অসহযোগ এবং এতে কোনও আইনের বাধা নেই। প্রথম অবস্থায় অসহযোগ করবে তারাই যারা এর যোগ্য এবং ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য প্রস্তুত। অনেকে যখন অসহযোগের পথে চলে আসে তখন ব্যাপকভাবে বয়কট আন্দোলন সুরু করা হয়। এর একাধিক প্রক্রিয়া আছে। সভাসমিতি করা, কর্তৃপক্ষের কাছে

বিশেষ কোন আইন রদ করার দাবী জানান, বয়কট করা জিনিষের বহ্ন্যুৎসব করা এবং সেই সব জিনিষ বিক্রয়ের কেন্দ্রে পিকেটিং করা ও গ্রামে গ্রামে সেই সব দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা আদি সব কিছু চলতে পারে, এ গেল কোন পণ্যের সাথে অসহযোগীতা করার কথা। কোন প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার সাথে অসহযোগ করতে হ'লে আপনাদের যতই কষ্ট হোক না কেন সেই বিধি ব্যবস্থার শরণ নেওয়া চলবে না এবং গ্রামে গ্রামে সে ব্যবস্থা বিকল্প নিজস্ব সংগঠন স্থাপন করতে হবে। যখন এই কার্য সাধনে আইনের বাধা আসে এবং সে আইন ভঙ্গ করার প্রয়োজনীতা দেখা দেয় তখনই সত্যাগ্রহ করতে হয়। তবে আপনারা যদি গঠনমূলক সংগঠনের ভিত্তিতে অসহযোগ এবং বয়কটের প্রবল আন্দোলন সুরু করেন তাহ'লে আমার বিশ্বাস যে এই গণতান্ত্রিক যুগে সত্যাগ্রহ করার দরকার পড়বে না।

প্রশ্ন ঃ—আপনার পরামর্শ হচ্ছে এই যে এই স্বরাজ ত্রিশঙ্কুরাজ বলে বর্ত্তমান পরিষদ আদিতে যোগদান করা নিরর্থক। নবীন বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার পরও কিছু না কিছু কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব তো থাকবেই। সে অধিকার কে হাতে নেবে? চরখা সংঘ কি সে সময়ে সে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হবে?

উত্তর ঃ—ততদিনে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট চেতনা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, এবং তারা নিজেদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত লোককে সেখানে পাঠাবে। স্বাবলম্বী সংগঠন হবার পর কেন্দ্রের হাতে অবশ্য ক্ষমতা কমই থাকবে, তবুও তাদের হাতে এমন সব উপায়

থাকতে পারে, যার দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার করার সম্ভব। সুতরাং জনসাধারণ যতই যোগ্য প্রতিনিধি সেখানে পাঠাক না কেন, তাদের পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত বসে থাকলে বিপদের আশঙ্কা আছে।

আপনারা একটী বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনী শুনে থাকবেন। কঠোর তপস্যা করার পরই কেউ ইন্দ্রাসন পেয়ে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রলোকে পৌঁছানর পরই তার কাজ হয় খুঁজে খুঁজে অন্য তপস্বী-দের তপস্যা ভঙ্গ করা। প্রথমে অপ্সরাদের পাঠান হয়। অধিকাংশ তপস্বী এতেই শেষ হয়ে যায়। অপ্সরার অস্ত্র বিফল হোলে বজ্র ত আছেই। এ যুগের মানুষ যতই খাঁটী হোক না কেন, তাদের পক্ষে ইন্দ্রের চেয়ে মহান্ তপস্বী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মানবের স্বভাব অনুযায়ী তারা ইন্দ্রের মতনই চলবে এবং এইভাবে গণতন্ত্রকে পায়ের নীচে রাখার চেষ্টা করবে। প্রাচীন কালে ইন্দ্র পাঠাতেন অপ্সরা আর আধুনিক যুগে পাঠান হয় উচ্চ সরকারী চাকুরী। আমরাও প্রতিনিয়ত এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছি। কিছু যুবক যুবতী দেশের জন্য ত্যাগ করে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। অল্পবিস্তর তপস্যা করা সুরু করলে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই ইন্দ্রলোকের অফিসারী আমাদের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে যায়।

এই জন্যই জনসাধারণের ভিতরে একজন শিব প্রয়োজন। শিব যতই তপস্যা করুন তিনি কখনো ইন্দ্রাসন পাবার অভিলাষ রাখেন না। সাধারণের মত তিনি সাধারণের মাঝে থাকেন এবং তাঁর

জনসাধারণের উপর অত্যাচার হলে সমস্ত জনশক্তি নিয়ে তিনি তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেন।

জনসাধারণের তাণ্ডব শক্তির নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য শিব তপস্বীদের খুঁজে খুঁজে বরদান করে বেড়ান। শিব না থাকলে ইন্দ্র নিশ্চয় একাধীনায়কে পরিণত হতেন। একটু আগেই আমি বলেছি যে গান্ধীজী কথিত পথে স্বরাজ বজায় রাখা তখনই সম্ভব হবে যখন জনসাধারণের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধের জন্য নিরন্তর বিদ্রোহ করার শক্তি থাকবে। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষমতা ছাড়াও যখন শিব শক্তির অস্তিত্ব থাকবে তখনই এ সম্ভবপর হবে। প্রথমে ইন্দ্র ছিল একজন; সুতরাং তাকে সংযত রাখার জন্য একজন শিব প্রয়োজন হত। এখন কিন্তু ইন্দ্র সংগঠিত রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং শিব শক্তিকেও প্রতিষ্ঠানের রূপে সংগঠিত করতে হবে। চরখা সঙ্ঘ আদি গঠনমূলক কাজের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এটা। অখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি হবে শিব এবং তাদের কাজ হবে স্থানে স্থানে যে সব ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তারা যাতে প্রয়োজন কালে জনসাধারণের দাবী দাওয়া নিয়ে তাদের সংগঠিত করতে পারে তার জন্য তাদের বরদান করা। সুতরাং চরখা সঙ্ঘ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গুলির রাজসত্ত্বা হাতে নেবার কোন কথাই ওঠে না।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু বর্ত্তমান গণতন্ত্রে পরিষদের বিরোধী দলই শিবের কাজ করে। তাহলে এই সব প্রতিষ্ঠানের পৃথক ভাবে শিব রূপে বিরাজ করার প্রয়োজন কি?

উত্তর ঃ--- জনসাধারণ প্রত্যেকের পিছনে মরিয়া হয়ে ছুটে নিজ জীবন বিপন্ন করে তাণ্ডব নৃত্য করতে প্রস্তুত হয় না। ভারতবাসী গান্ধীজীরই আহ্বানে সাড়া দিত; কারণ গান্ধীজীর উপর তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। যে দল ও ব্যক্তির উপর জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে আস্থাশীল হবে না, তাদের নেতৃত্বে জনসাধারণ কখনই বিদ্রোহ বা বিপ্লব করবে না। পরিষদের বিরোধী দলের প্রতি জনসাধারণ যে পূর্ণ আস্থাবান একথা বলা যায় না। কারণ পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে তো জনসাধারণ তাদেরই নির্ব্বাচিত করে শাসন ব্যবস্থার পরিচালক করত। অধিক সংখ্যক জনসাধারণ যাদের বাতিল করে ভোট দেয় না তাদেরই বলা হয় বিরোধী দল। তা ছাড়া সাধারণতঃ এ দলের দৃষ্টি থাকে সিংহাসনের দিকে। সুতরাং স্বরাজ রক্ষার্থ শিবের ভূমিকা এরা নিতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ—নবীন বিপ্লবের জন্য যুব সম্প্রদায়কে তো আহ্বান জানাচ্ছেন; কিন্তু তারা এসে করবে কি? সংগ্রামের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ বর্ণনা করলে না হয় এ সম্বন্ধে চিন্তা করা যেতে পারে। এই রকম বিপ্লবের কথা শুনতে শুনতে লোকের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের অগ্রসর হবার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে না দিলে শান্তি পাওয়া যায় না।

উত্তর ঃ—এ বিপ্লবের পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি তো আমার বক্তৃতাতে বলেইছি। আমি জানিয়েছি যে কেন্দ্রিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটাতে হবে এবং তার পরিবর্ত্তে বিকেন্দ্রিত শ্রমবাদী উৎপাদন এবং স্বাবলম্বী গণতান্ত্রিক শাসন

কায়েম করতে হবে। বস্তুতঃ এ জাতীয় বিপ্লবের প্রতিটী ধাপ পূর্ব্বাহ্নে ছকে রাখা যায় না। বিপ্লবীকে অবস্থা বুঝে প্রতি পদ-বিক্ষেপে কর্ত্তব্য নির্ণয় করতে হবে। কার্য্যারম্ভের প্রথম ধাপ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। এই জন্যই গান্ধীজী বলতেন, "আমার কাছে পরবর্ত্তী পদবিক্ষেপই যথেষ্ট।" তবে আপনারা কতদূর এগোতে পারেন তার একটী মোটামুটি চিত্র আপনাদের সামনে পেশ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ আপনাদের নিজ জীবনে বিপ্লব সাধন করতে হবে। নিজেদের বাবুগিরি ছেড়ে শরীর শ্রম করে উৎপাদনের কাজ করতে হবে অর্থাৎ স্বীয় জীবনে শ্রেণী পরিবর্ত্তনের বিপ্লবকে মূর্ত্ত করতে হবে। তা হলে আপনারা গ্রামের কৃষক মজতুরদের সাথে একাত্ম হতে সক্ষম হবেন। এ যাবত আমরা নিজ জীবনে হয়ত অনেক ত্যাগ করেছি; কিন্তু বিপ্লব করিনি। জনসেবার জন্য জীবন যাত্রার মান নীচু করাকে বলে ত্যাগবৃত্তি এবং সমাজের কাঠামো পরি-বর্ত্তনের জন্য জীবনের চাল চলনে পরিবর্ত্তন সাধন করার নাম হচ্ছে বৈপ্লবীক বৃত্তি। ত্যাগ করার উদাহরণ হচ্ছে হাজার টাকার মাইনের বদলে তু একশত টাকায় জীবন নির্ব্বাহ করা। কিন্তু এই তুই একশত টাকার খোল আনা অপরের শরীর শ্রমে উৎপন্ন সম্পদ। অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে আমরা হাজার টাকার শোষণ করতাম, এখন সেখানে শ্রমিকদের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে মাত্র তুইশত টাকার শোষণ করব। বিপ্লব করতে হলে আমাদের শরীর শ্রম দ্বারাই জীবন নির্ব্বাহ করতে হবে। একথা ঠিক যে হঠাৎ

আপনারা এ পন্থায় স্বাবলম্বী হতে পারবেন না এবং এমনও হতে পারে যে সারা জীবনেও আপনারা এ পন্থায় পূর্ণ স্বাবলম্বী হলেন না। কিন্তু শ্রেণী পরিবর্ত্তনের এই জীবন বিপ্লবের পথে পা দিয়ে অগ্রসর হবার কাজ তো আরম্ভ করতেই হবে।

অতঃপর গ্রামে যেয়ে গ্রামবাসীদের ভিতর অনুপ্রেরণা এবং নেতৃত্ব শক্তির বিকাশ সাধন করে ছোট ছোট সংগঠনের একম্ স্থাপন করে তাদের বর্জনমূলক এবং গঠনমূলক এই উভয়বিধ বিপ্লবের পথ দেখাতে হবে। আগেই আমি বলেছি যে এ কার্যক্রম উৎপাদন এবং ব্যবস্থা এ দুয়ের জন্য অনুসরণ করতে হবে। প্রথমে আমি আর্থিক ক্ষেত্রের পর্য্যালোচনা করব। পুঁজির ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বয়কটের রূপ নেবে এ কার্যক্রম।

প্রথমতঃ আমাদের এ জন্য খাদ্য ও পরিধানের সামগ্রী বেছে নিতে হবে এবং প্রথমাবস্থায় ব্যক্তিগত অসহযোগের পথ ধরতে হবে। অর্থাৎ গ্রামসঙ্ঘের সদস্যদের কলের চিনি, তেল, আটা ও চাল আদি খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। তারপর বিভিন্ন গ্রাম সংগঠনের মধ্যে এই কাজ স্বরু করতে হবে। কোন অঞ্চলে এই রকম অন্নবস্ত্রের ব্যাপারে মিল বর্জনের যথেষ্ট সংখ্যক কেন্দ্র যখন স্থাপিত হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে যখন এর অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি হবে তখন আর এক পা এগিয়ে ব্যাপকভাবে বর্জনের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বড় বড় জনসভার আয়োজন করে সেখানে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে যে সরকার যেন অমুক জিনিষটীর আমদানী সেই ক্ষেত্রে

নিষিদ্ধ করেন এবং সরকারের কাছে এই মর্ম্মে গণআবেদন পত্রও পাঠাতে হবে। তদানীন্তন সরকার যদি গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীত স্বাবলম্বী আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হন তবে তাঁরা আপনাদের দাবী মেনে নেবেন। নচেৎ আপনাদের পিকেটীং আদি সত্যাগ্রহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে।

আর্থিক ক্ষেত্রের আন্দোলন কালে গ্রাম খানিকটা শক্তিশালী হয়ে উঠলে শাসনের ক্ষেত্রেও সুনির্দ্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত: আপনাদের প্রতিটী মহকুমার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং আপনারা যে সংগঠন গড়ে তুলবেন তাকে সারা মহকুমার ভার নিতে হবে। এইভাবে বেশ খানিকটা অগ্রসর হবার পর দু একটী বিভাগের বিলুপ্তির দাবী জানাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন যে কোন এলাকার গ্রামগুলি যেন কৃষি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কাজে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেছে। তখন সেই সব গ্রামবাসী এই আবেদন জনাবে যে তাদের এলাকায় যেন সরকারী কৃষি ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সরকার এই খাতে যত অর্থ ব্যয় করেন, তাদের কর ভার যেন সেই পরিমাণে লাঘব করা হয়। সরকার আপনাদের মতাবলম্বী হলে এই দাবী মেনে নেবে। আর এমন যদি না হয় তবে সরকার এই দুই বিভাগ বন্ধ করুন বা না করুন আপনারা সরকারকে সেই পরিমাণ খাজনা কম দেবেন।

আমার পূর্ব্বোক্ত বক্তব্য শুধু একটী খসড়া মাত্র। কার্যক্ষেত্রে নামলে পরিস্থিতি অনুসারে নতুন নতুন পথ খুঁজে পাবেন।

প্রশ্ন ঃ—বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে যে রাস্তা দেখালেন এবং যে সঙ্কটের সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করলেন তাতে আমাদের চিন্তা শক্তি বেশ স্পষ্ট হয়েছে। সাধারণ কর্মিদের মনের নৈরাশ্য ভাব বহুল পরিমাণে দূর হয়েছে। তবে ইতোপূর্ব্বে যে সব সংগ্রাম হয়েছে, কংগ্রেসের তরফ থেকে তারজন্য পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল এবং সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। আজ তো সেরকম হচ্ছে না। আপনি চরখা সঙ্ঘের সভাপতি। আপনি নিজ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করেন না কেন? আমাদের মত দেশের যুব সম্প্রদায় কিছু করার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমাদের জন্য কোথাও পথ খুলে দিন।

উত্তর ঃ—চরখা সঙ্ঘের তরফ থেকে তো পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। দেশের যুব সম্প্রদায়কে চরখা সঙ্ঘ গ্রামে গ্রামে কাতাই মণ্ডল স্থাপনা করে এই কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। * এই সংগঠনের নাম কাতাই মণ্ডল রাখার কারণ গান্ধীজীর বিপ্লবের মূল ছিল চরখা। গান্ধীজী তাকে অহিংসার প্রতীক বলতেন। আমাদের পরিকল্পনার খসড়া এবং নিয়ম নীতি আপনারা সেবাগ্রাম থেকে জানতে পারবেন। কিন্তু আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে চরখা সঙ্ঘই গ্রামে গ্রামে যেয়ে এই সংগঠন গড়ে তুলবে এবং আপনারা শুধু টাকা পয়সা দিয়ে বা ঐ জাতীয় কোন উপায়ে চরখা সঙ্ঘকে সাহায্য করবেন, তা হলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আপনাদের

* সব কটী গঠনমূলক কাজের প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হওয়ার পর এর নাম দেওয়া হয়েছে "সর্ব্বোদয় মণ্ডল।"

আদর্শপূর্তি হবে না। সমগ্র পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে আপনাদের এবং চরখা সঙ্ঘ আপনাদের সাহায্য করবে। চরখা সঙ্ঘে এমন কিছু সেবক থাকবেন, প্রয়োজন কালে যাঁরা আপনাদের সাহায্য করবেন। প্রেরণা ও নেতৃত্ব নীচে থেকে গড়ে না উঠলে আপনাদের আবার প্রবঞ্চিত হতে হবে। সুতরাং যাঁরা এ পরিকল্পনার সাফল্য চান তাঁরা আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন এবং নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রস্তুতি করুন ও প্রয়োজন বোধ করলে আমাদের পরামর্শ নিন। এইভাবে এ কাজ চলতে পারে। কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে কর্মী পাঠিয়ে কাজ করত না। কংগ্রেসের কাজ চালাতেন আপনারা স্বয়ং। উপর থেকে শুধু বুদ্ধি পরামর্শ পাওয়া যেত। এখন তো নেতৃত্বকে নীচের থেকে বিকশিত করার প্রয়োজন আগের চেয়েও বেশী।

প্রশ্ন :—কিন্তু যারা নিজেদের জীবন সম্পূর্ণভাবে এ কাজে সমর্পন করতে চায়, চরখা সঙ্ঘ কি তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করবে না?

উত্তর :—তাঁরা সেবক রূপে চরখা সঙ্ঘে যোগদান করতে পারেন। তবে যিনি নিজেকে এ ভাবে সমর্পন করতে চান, তাঁকে বিশেষ কোন স্থানের মোহ রাখলে চলবে না। ভারতের যে কোন কোণে যেতে প্রস্তুত না থাকলে এ সমর্পনের কথা অলীক।

বাঙলা ভাষায় ধীরেন্দ্র মজুমদারের রচনাবলী প্রকাশিত হওয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকারী ঘটনা। রাজনীতি, অর্থ শাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান আদি দুরূহ অথচ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত। অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এ যুগের এই সব দুরূহ তথ্যকে সর্ব্বজন বোধ্য ভাষায় বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে স্বচ্ছ ভাবে বিশ্লেষণ করা ধীরেন্দ্র মজুমদারের বৈশিষ্ট। শ্রীশৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদের গুণে প্রত্যেকটী পুস্তকে পাবেন মূল গ্রন্থের স্বাদ। এঁর প্রথম গ্রন্থ "স্বাধীনতার সংকট" সম্বন্ধে **যুগান্তর** বলেন, "............মজুমদার মহাশয়ের সরল অথচ বলিষ্ঠ যুক্তি এই সব ভাষণের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। ... .এই বাধার (দেশের উন্নতির) স্বরূপ, লক্ষণ এবং ইহা দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে মজুমদার মহাশয়ের চিন্তাধারা প্রত্যেক দেশবাসীর পক্ষে পন্থা নির্দ্দেশক হইবে। **লোকসেবক** বইটীর দীর্ঘ প্রশস্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "............মৌলিক চিন্তা ধীরেন্দ্র মজুমদারের বৈশিষ্ট। এই পুস্তকে লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই যে গান্ধীজীর বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করিবে বিপ্লবী কর্মীর দল, সরকার নয়। .... স্বাধীনতার বিবিধ সংকটের কথা পুস্তকখানিতে আলোচিত হইয়াছে। অনুবাদ প্রাঞ্জল। উপসংহারে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে

কাল নৃত্য করে অনুভব

মাতৃরূপা তারি পাশে আসে।'

মাসিক **সংহতি** বলেন, "........ পুস্তকখানি বহু তথ্যপূর্ণ এবং আমরা আশা করি প্রত্যেক বাঙালী এইরূপ একটী চিন্তাশীল সংগঠক কর্মীর চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবেন।" **স্বরাজ ও সংগঠন** বলেন, "............গান্ধীজীর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা কি ভাবে সংকটাপন্ন হয়েছে এবং কি ভাবেই বা ভারত সে সংকট থেকে উদ্ধার পেতে পারে, মহাত্মাজী পরিকল্পিত অহিংস বিপ্লব সফল হয়ে সর্ব্বোদয় কি ভাবে রূপায়িত হতে পারে; তা সুন্দর ভাবে বিবৃত হয়েছে। অনুবাদ ভাল।"

এ ছাড়া *দেশ* প্রমুখ আরও বহু পত্র পত্রিকা এবং মনীষীবৃন্দের প্রশংসা ধন্য এই বইটীর দাম বার আনা মাত্র।

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত অন্যান্য বিখ্যাত পুস্তক—

মহাত্মা গান্ধীর—

আমার ধ্যানের ভারত ২॥০

আলডুস হাক্সলের —

বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি ২৲

ধীরেন্দ্র মজুমদারের—

যুগের দাবী ভূদান যজ্ঞ (যন্ত্রস্থ)

মনীষা প্রকাশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং প্রত্যেকটী পত্র পত্রিকা ও সুধীবৃন্দ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত এই পুস্তকগুলি পাবেন *মিত্র ও ঘোষ ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২ এবং প্রতিটী সম্ভ্রান্ত বইএর দোকানে।*

মণীষা প্রকাশন মণীষা প্রকাশন মণীষা প্রকাশন

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের অমিত প্রগতি[illegible] স্বাধীনতা আজ খর্ব্ব। কোন যুগেই এ[illegible] হাতে এত অধিক সংখ্যক লোকের জীবন ম[illegible] নির্ভরিত ছিল না। এর ফলে সাধারণ ম[illegible] কৃতদাসের পর্য্যায়ে নেমে যাচ্ছে তেমনি বিশ্ব শান্তি ব্যহত হয়ে সমগ্র মানব সমাজকে ধ্বংসের নিশ্চিত ঘূর্ণাবর্ত্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমান বিশ্বের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টী নিয়ে বিশ্ববিশ্রুত মনীষী আলডুস হাক্সলে যে আলোচনা করেছেন তারই বঙ্গানুবাদ **শ্রীশৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**

বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি······২৲

মানব সমাজের সামনে যে সমস্যা আজ এক প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার রূপে উদ্যত এবং যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর সারা সভ্যতার ভবিষ্যত নির্ভর করছে সে সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচার ধারার আলোকে শিক্ষিত আলড়ুস হাক্সলের রচনার অনুবাদ নিঃসন্দেহে বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ অবদান।

বইটীর ভূমিকায় যশস্বী সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশী বলছেন"············শ্রীশৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান পুস্তক খানির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন এজন্য তিনি বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র।" বহু মনীষী ও সমালোচকের প্রশংসাধন্য এই অমূল্য গ্রন্থ আজই এক কপি নিজের জন্য সংগ্রহ করুন।

মণীষা প্রকাশন মণীষা প্রকাশন মণীষা প্রকাশন